

A_9XWZ

†Kvm†KvW : SSC 2605

tm†KŪwi -j mwU†KU tcŌMög
(Gm Gm vm tcŌMög)

ଓମେନ ସ୍କୁଲ



ersj v†` k Db†B wek†e` ``vj q

A_୭୩୩Z

†K୩୧K୩W : SSC-2605

†m†KŪv୩i ṽḡ m୩U†KŪ tĉMŌḡ
(Gm Gm ୩m tĉMŌḡ)

i Pbvq

W. tḡvt Ave`j R୩j j

m୩tĉK ୩୩R, b୩tḡḡ (NAEM), X୩K୩|

cḡḡ q Kḡv୩i ṽḡ n ୩b†q୩M୩

୩KḡK (Aemi cŌB), t୩m†W୩Yq୩j ḡtWj ṽḡ ḡŪ K†j R, X୩K୩|

tḡvt ୩ḡR୩bvj i nḡvb

m୩K୩i x Aa`vcK, I †cb ṽḡ, evD୩e|

mṽúv`bvq

W. tḡvt Av†k© Avj x ḡvZḡYi

m୩†h୩M୩ Aa`vcK, I †cb ṽḡ, evD୩e|

tḡvt ୩ḡR୩bvj i nḡvb

m୩K୩i x Aa`vcK, I †cb ṽḡ, evD୩e|

mḡšḡK୩i x

Z୩m୩i "b R୩n୩b

c†v୩K, I †cb ṽḡ, evD୩e|

ଓମେନ ସ୍କୁଲ



evsj v†`k DbYḡ ୩ek୩e`ṽj q

A_୭୩୩

†K୩ଂK୩W : SSC-2605

†m†K୦୩ି ିଂଂ m୩୩†K୩ t†M୦ଂ
(Gm Gm ୩m t†M୦ଂ)

ଓମନ ସ୍ତୂଳ



evsj v†` k Dbyଂଂ ୱେକ୍ତୱେ` ୩ଂଂଂ q

A_0XNZ

tKvm©KvW : SSC-2605

Gm Gm m tC0M0g

cKvk Kvj : Wtm±† 1996

cpgjY : 1998, 1999, 2002, 2003, 2009

cpgjY : 2011

c0Q`

KvRx mVBdž xb AveŸvm

c0Q` M0nd.

Avāj grtj K

Kw±uDUvi Kt±úvR

tgrt mmwí Kj Bmj vg

tgrt GKivgj nK fBTv

© eisj vt` k DbžB wekte`vj q

ISBN 984-34-3059-X

cKvkbvq

cKvkbv, gjY I weZiY wefM

eisj vt` k DbžB wekte`vj q

MvRxcj - 1705 |

gjY

†eY©cUvm©

18/26/4 iLj vj `vm tj b

mFvcj, XvKv |

A_bxwZ

mPcI

	côv
BDwbU-1 c0_wgK cwi wPwZ	
cv -1 msÁv, weI qe` I AvI Zv	01
cv -2 A_0wZ cvtVi c0qvRbxqZv	04
cv -3 evsj vt` tki cwi t0wZ A_0wZ cvtVi c0qvRbxqZv	06
BDwbU-2 m0u` t evsj vt` tki c0KwZK m0u`	
cv -1 m0u` i msÁv I `enk0`	08
cv -2 m0u` i tkYwefvM	10
cv -3 evsj vt` tki LwbR m0p`	12
cv -4 evsj vt` tki c0wYR m0p` I cwb m0u`	14
BDwbU-3 DcthvM I tfvM	
cv -1 msÁv, tgvU I c0ŠK DcthvM	16
cv -2 tgvU DcthvM I c0ŠK DcthvM m0u`K, c0ŠK DcthvM I `vg	19
cv -3 μgnwgvb c0ŠK DcthvM weia I Gi e`wZμg	20
cv -4 tfvM I Zwb	22
BDwbU-4 Pwv`v I thvMvb	
cv -1 Pwv`vi A_0weia I weiai e`wZμg.....	25
cv -2 Pwv`vi mPx, Pwv`v ti Lv, Pwv`vi w`wZ`vcKZv	28
cv -3 mieivn ev thvMvbi A_0weia I weiai e`wZμg	30
cv -4 thvMvb mPx, thvMvb ti Lv I thvMvbi bgbxqZv	31
BDwbU-5 Drcv`b I Drcv`tbi DcKiY	
cv -1 Drcv`tbi msÁv I DcthvMvMi tkYwefvM	35
cv -2 fvg	37
cv -3 ktj.....	40
cv -4 gj`vj`v`mi RbmsL`v ZÉj.....	42
cv -5 ktgi `qZv	44
cv -6 cR ev gj`ab	47
cv -7 msMvb	49
BDwbU-6 evRvi	
cv -1 evRvti i A_0 AvqZb	51
cv -2 evRvti i tkYwefvM	53
cv -3 evsj vt` tki wefba0Y` I tmevi evRvi	56
cv -4 evsj vt` tki Kw cY`i evRvi t cvtUi wecYb	58
BDwbU-7 RvZxq Avq	
cv -1 RvZxq Drcv`b I RvZxq Avq	61
cv -2 evsj vt` tki Drcv`b e`e`v, Drcba0`emgn I Zvt` i tkYwefvM	63
BDwbU-8 eUj	
cv -1 eUjbi avi Yv- Drcv`tbi wefbaDcKiYi gta` eUj	67
cv -2 eUjbi c0ŠK Drcv` bkxj Zvi ZÉj.....	69
cv -3 evsj vt` tki eUj e`e`v	70

BDwbU-9	evsj vt`tki tgsij K A_šwZK mgm`v I Zvi mgravb	
cv -1	evsj vt`tki tgsij K A_šwZK mgm`v	73
cv -2	evsj vt`tki tgsij K A_šwZK mgm`v mgravtbi Dcvq	76
BDwbU-10	A_š e`vsK e`e`v	
cv -1	Aš_p cšj b	78
cv -2	Aš_p msÁv I Kvhfej x	81
cv -3	e`vsK e`e`v	83
cv -4	tK`šq e`vsK I ewYR`K e`vsťKi Kvhfej x	86
BDwbU-11	evsj vt`tki Kwl	
cv -1	evsj vt`tki Kwl Lvgvi	89
cv -2	evsj vt`tki RvZxq Avťq Kwl i Ae`vb	91
cv -3	evsj vt`tki Kwl i mgm`v	92
cv -4	evsj vt`tki Kwl Dbťtbi Dcvq	95
BDwbU-12	evsj vt`tki wkí I ewYR`	
cv -1	wkťí i cšqvRbxqZv I Kgšs`vb mšó	97
cv -2	šž`a I Kwl i wkí	100
cv -3	evsj vt`tki ep`vqZb wkí	103
cv -4	wkťí i `vbxqKi Y	106
cv -5	evsj vt`tki ewYR`	108
BDwbU-13	evsj vt`tki RbmsL`v	
cv -1	evsj vt`tki RbmsL`vi `ťc	111
cv -2	RbmsL`v ewx`i dtj mó A_šwZK I mvgwRK mgm`vmgn	114
cv -3	RbmsL`v mgm`v mgravtbi Dcvq	117

GB eBUW wKfvte coteb

GB eBUW `i wKfY c×wZi QvTQvT`i Rb` i wPZ ntqtQ| cPwj Z c×wZi eBtqi tPtq GLvrb
cvMvgM0 wfbvte Dc`vcb Kiv ntqtQ| cvMvgM0 Dc`vcbvi G c×wZ gwiz vi c×wZ bvtg cwi wPZ|
`i wKfY c×wZi QvTQvT`i tK AwaKvsk mgq wKfYtKi mivmwi mnvqZv Qvon wbtRB covtkvbn Ki tZ
nq| G Kvi tYB eBUWi welqe` hZ`i mæe wbtR cto eSvi DcthvMx Kti i Pbv Kiv ntqtQ|
wKfYv_xPv hv tZ GB eB cto AwaKZi mjdj jvf Ki tZ cvtib tmRb` wbtP wKQywbqg Ztj aiv nj t

1. BDwBU ev Aa`vtqi wktivbvg l fvgKv cto mæe` welqe` wK ntZ cvti tm mK©avi Yv Ki`b|
fvgKv cvtV Avcbv cti v BDwBUi welqe`i c0_vgK avi Yv jvf Ki tZ cvi teb|
2. c0_g cvtVi me_tj v 0DfI k0 cto GB cv t_tK wK wK wKL tZ cvi teb Zv tRtb wbb|
3. Gici cvWU gtbvthvM mnKvti cob| cvWtk tI cvtVvEi gj`vq tbi c0q t j vi DEi t` l qvi tPón
Ki`b| BDwBUi tktI t` l qv DEi gvj vi mft_ Avcbvi DEi wgvj tq t` Lp| me_tj v c0K0 DEi
mWVK bv ntj GB cvWU Avei l fvj Kti cob Ges c0q t j vi DEi w` tZ tPón Ki`b| Gici
i Pbv gj K c0q t j vi DEi Rvbn AvtQ wKbv t` Lp| Rvbn bv_vK t j msvk0 Ask Avei l cob|
GKB c×wZ Abymiy Kti cti v BDwBUU tkl Ki`b|
4. tKvb Ask wbtR eSv mæe bv ntj wJD tUwi qvj tK t` i wKfYtKi mnvqZv wbb|
5. c0Z`K cvtVi tkl fvM cvtVi mvi mstf c t` l qv AvtQ| mvi mstf c gtb_vK t j mæuY©cvW gtb
Kiv mnR nq| ZvB mvi mstf c gtb ivLvi tPón Ki`b|

bgjv cke

GmGmim tcm0g

A_0wZ, tKvqKW- SSC-2605

gvbeUb

i Pbvj K-50

be³K-50

i Pbvj K

* QqW eo cke_vKte 3wJi DEi w`tZ nte cZw cke gvb -10	10×3=30
* AvUw msrTjB DEi cke_vKte 4wJi DEi w`tZ nte cZwJi gvb-5	5×4=20
* be ³ K	50
	<hr/> me ³ U = 100

be³K Astki ckeT ne wbæifc-

1 GK K_vq DEi w`b- 10w--	1×10 = 10
2 kb`vb ciY- 10w--	1×10 = 10
3 mZ`-wg`v- 10w--	1×10 = 10
4 wj Kib- 10w --	1×10 = 10
5 mwK DEi wj Lp-10w	1×10 = 10

ইউনিট ১

প্রাথমিক পরিচিতি

ভূমিকা

কর্মব্যস্ত এই পৃথিবীতে সবাই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত রয়েছে। যেমন— শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন, চিকিৎসক হাসপাতালে রুগীর সেবা করছেন, জেলেরা মাছ ধরছেন, শ্রমিক কলকারখানায় কাজ করছেন, অফিস আদালতে কর্মচারীরা কাজ করছেন। সবাই ব্যস্ত। কিন্তু কেন এই ব্যস্ততা? এর উত্তর জানতে হলে অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকতে হবে। এই ইউনিটে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১ : সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও আওতা

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- অর্থনীতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- অর্থনীতি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অর্থনীতির আওতা বর্ণনা করতে পারবেন।

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ

মানুষের যে কাজ অর্থ আয় ও ব্যয়ের সাথে জড়িত তাকে অর্থনৈতিক কাজ বলে। যেমন— শিক্ষকের শিক্ষকতা, ডাক্তারের চিকিৎসা, শ্রমিক ও কৃষকের পরিশ্রম সবই অর্থনৈতিক কাজ। কিন্তু মানুষের সব কাজই অর্থনৈতিক কাজ বলে বিবেচিত হয় না। যেমন— মায়ের সেবা-যত্নের জন্য কোন পারিশ্রমিক দিতে হয় না। তাই এটা অর্থনৈতিক কাজ নয়। কিন্তু হাসপাতালের নার্সের সেবার বিনিময়ে অর্থ দিতে হয় বলে এটি একটি অর্থনৈতিক কাজ। সুতরাং **যেসব কাজের বিনিময় মূল্য আছে অর্থাৎ যেসব কাজের জন্য অর্থ দিতে হয়, কেবলমাত্র সেগুলোই অর্থনৈতিক কাজ।**

এখন প্রশ্ন হল, মানুষ কেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়? দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন জিনিসপত্রের অভাব বোধ করি। কিন্তু এই অভাব মেটানোর জন্য আমাদের হাতে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নেই, যে প্রদীপের দৈত্যকে হুকুম করার সাথে সাথে সব জিনিস এনে হাজির করবে আর তা দিয়ে অভাব পূরণ করা যাবে। তাই আমরা সকলেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হই। **অভাব মোচনের উপকরণের স্বল্পতা আমাদের অর্থনৈতিক কাজকর্মে দুইভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত, এটি আমাদের অপচয় পরিহার করে উপকরণসমূহ যতটা সম্ভব প্রচুর করে তুলতে বাধ্য করে। দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের উপকরণসমূহ এমনভাবে ব্যবহারের নির্দেশ দেয় যাতে জিনিসপত্রের উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়ানো যেতে পারে।**

অর্থনীতি কি?

কোন কোন লেখকের মতে অর্থনীতি ধন বা সম্পদের বিজ্ঞান। আবার কোন কোন লেখকের মতে এটি মানুষের কল্যাণের শাস্ত্র। অর্থনীতি চর্চা প্রথম শুরু হয় প্রাচীন গ্রিসে। ঐ দেশে অর্থনীতিকে পরিবার পরিচালনার বিজ্ঞান বলে গণ্য করা হত। পরিবার পরিচালনা বলতে পরিবারের সদস্যদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সমস্যা এবং এসব সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত কাজকর্মে বুঝায়। খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল, এল রবিন্স ও অন্যান্যরা অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিচে আমরা অর্থনীতির সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করব।

অভাবের মধ্যে মানুষের জন্ম। জন্মের পর হতেই মানুষ নানা প্রকার অভাবের সম্মুখীন হয়। এই অভাবের কোন শেষ নেই। একটি অভাব পূরণ হলে নতুন আরেকটি অভাব দেখা দেয়। যেমন, মাথা গুঁজবার একটু জায়গা হলে পর মুহূর্তে আমরা ভাবতে থাকি কিভাবে একে দালানে পরিণত করা যায়। ভাতের অভাব পূরণ হলে পোলাও খেতে ইচ্ছে হয়। এভাবেই অভাব বাড়তে থাকে। মানুষকে সব সময় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি অভাব পূরণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। অভাব সীমাহীন হলেও অভাব পূরণের সম্পদ বা উপকরণ সীমিত। সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ

চেষ্টা করে আসছে কিভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণ করা যায়। মানুষের অধিকাংশ কাজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ উপার্জন এবং এই অর্থ দ্বারা অভাব পূরণ করা। যে শাস্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক কাজ বা অর্থ আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে তাকে অর্থনীতি বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে শাস্ত্র মানুষের অসীম অভাব সীমিত সম্পদ দ্বারা মেটানোর প্রচেষ্টা আলোচনা করে তাকে অর্থনীতি বলে।

অর্থনীতির বিষয়বস্তু

সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা আমরা কিভাবে সমাধান করি তা নিয়েই অর্থনীতি আলোচনা করে। আমাদের দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়া ও বেঁচে থাকার সমস্যাই অর্থনৈতিক সমস্যা। আর এই অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে অভাববোধ। এই অভাববোধ থেকেই অর্থনীতির আলোচনা শুরু। মানুষের অভাব অসীম। বেঁচে থাকার জন্য আমরা অনেক কিছুই অভাব বোধ করি। আমরা চাই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও আমোদ-প্রমোদ। কিন্তু সবই সমানভাবে এগুলো ভোগ করতে পারে না। এর কারণ সম্পদের সীমাবদ্ধতা।

পশু-পাখির মত কেবল জীবন-ধারণ করেই মানুষ সন্তুষ্ট নয়। মৌলিক অভাবগুলো মেটানোর পর সে উন্নততর জীবন-যাপন করতে চায়। তাই মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আরামদায়ক ও বিলাস দ্রব্য পেতে আগ্রহী হয়। যেমন— টিভি, ফ্রিজ, মোটরগাড়ি ইত্যাদি। এসব অভাব মিটলে আবার দেখা দেবে নতুন অভাব, যেমন— বিদেশ ভ্রমণ, নতুন বাড়ি ক্রয় ইত্যাদি। এভাবে মানুষ অভাবের পেছনে ছুটে চলেছে। মোট কথা **অভাবের কোন শেষ নেই।** একটা অভাব মিটলে নতুন নতুন অভাবের সৃষ্টি হয়। মানুষ কিভাবে সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম অভাব পূরণ করে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করতে পারে তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

অর্থনীতির আওতা

পূর্বের আলোচনা থেকেই অর্থনীতির আওতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি নিচে অর্থনীতির আওতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। অর্থনীতি একটি সমাজবিজ্ঞান। কারণ এই বিজ্ঞানটি সমাজে বসবাসকারী মানুষের অভাব পূরণ সম্পর্কিত কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করে।

অর্থনীতি সমাজে বসবাসকারী মানুষের সব কাজ নিয়ে আলোচনা করে না। শুধু যেসব কাজ অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় সেগুলো অর্থনীতির আলোচনার আওতাভুক্ত।

মানুষের এ ধরনের কার্যাবলীকে চারভাগে ভাগ করা যায় : (ক) উৎপাদন, (খ) বিনিময়, (গ) বন্টন ও (ঘ) ভোগ। এছাড়া (ক) জনসংখ্যা, (খ) মুদ্রা, (গ) ব্যাংক, (ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য এবং

(ঙ) সরকারি আয়-ব্যয় প্রভৃতিও অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

উপসংহারে বলা যায়, অর্থনীতির আওতার ক্রমশ বিস্তার ঘটছে। পরিবর্তনশীল সমাজে অর্থনীতির আওতার নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করা সহজ নয়। কারণ অর্থনীতি একটি প্রগতিশীল সমাজ বিজ্ঞান।

সারসংক্ষেপ

- অভাব সীমাহীন। অভাব পূরণের উপকরণ সীমিত। এই সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাব— এই দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যে কর্ম প্রচেষ্টা তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।
- অর্থনীতি সমাজে বসবাসকারী মানুষের অর্থ আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত কাজকর্ম আলোচনা করে।
- উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ সম্পর্কেও আলোচনা করে।
- জনসংখ্যা, অর্থ, ব্যাংক, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সরকারি আয়-ব্যয়ও অর্থনীতির আলোচনার আওতাভুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

১। অর্থনৈতিক কাজের লক্ষ্য কি?

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ক. অর্থ খরচ করা | খ. দরিদ্রকে দান করা |
| গ. সম্পদ আহরণ করা | ঘ. অভাব মেটানো |

২। মানুষের অভাব কিরূপ?

- | | |
|----------|------------|
| ক. বেশি | খ. অসীম |
| গ. সীমিত | ঘ. খুবই কম |

- ৩। কোনটি অর্থনৈতিক কাজ?
ক. শিক্ষকের শিক্ষকতা খ. মায়ের পরিচর্যা
গ. ভিক্ষে করা ঘ. চুরি করা
- ৪। অর্থনীতির প্রকৃত বিষয়বস্তু কি?
ক. অর্থ আয় খ. অর্থ ব্যয়
গ. অর্থ সঞ্চয় ঘ. অভাব মোচন
- ৫। মানুষ কাজ করে কেন?
ক. অর্থ উপার্জনের জন্য খ. সুস্থ থাকার জন্য
গ. মানুষের কল্যাণের জন্য ঘ. দৈহিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। অর্থনৈতিক কাজ কাকে বলে?
২। অর্থনীতি কাকে বলে?
৩। অর্থনীতির বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
৪। অর্থনীতির আওতা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় কি?

পাঠ ২ : অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আধুনিক যুগে অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই অর্থনীতিকে বর্তমান যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম বলে মনে করা হয়। নিচে অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

- ১। দৈনন্দিন জীবনে :** প্রাত্যহিক জীবনে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রতিটি মানুষের অসীম অভাব পূরণের কাজে ব্যস্ত। অর্থনীতির জ্ঞান থাকলে মানুষ অভাব মোচনের উপকরণের স্বল্পতার সমস্যা ভালভাবে বুঝতে এবং সমাধানের চেষ্টা করতে পারে।
- ২। সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহার :** অর্থনীতি পাঠ থেকে দেশের সীমিত সম্পদের সাহায্যে কিভাবে জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যাবে তা জানা যায়। এছাড়া কোন দ্রব্য কতটুকু উৎপাদন করতে হবে এবং কিভাবে তা বণ্টন করতে হবে তাও জানা যায়।
- ৩। ব্যবসায়ীদের নিকট :** ব্যবসায়ীদের কাছে অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বাজারে কোন দ্রব্যের কি চাহিদা, ভবিষ্যতে এই চাহিদার কি পরিবর্তন হতে পারে সে সম্পর্কে ব্যবসায়ীর জ্ঞান থাকতে হবে। তা না হলে ব্যবসা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকটা অর্থনীতির জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।
- ৪। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :** বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ দেশই সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নতির চেষ্টা করছে। দেশের সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োজন হয়। অর্থনীতির জ্ঞান থাকলে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজ হয়।
- ৫। রাজনীতিবিদদের নিকট :** দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে রাজনীতিবিদদের ধারণা থাকতে হবে। তা না হলে সরকারের নীতি নির্ধারণ ও কর্মপন্থা ঠিক করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্থনীতির জ্ঞান এ ব্যাপারে রাজনীতিবিদদের সাহায্য করতে পারে।
- ৬। সরকারি প্রশাসনে :** সরকারকে প্রতিবছর আয়-ব্যয়ের হিসাব করতে হয়। সরকারের ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ নীতি, কর আরোপ ও সংগ্রহনীতি, বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অর্থনীতি তাদেরকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে।
- ৭। শ্রমিক নেতৃবৃন্দের নিকট :** শ্রমিক নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা, অন্যান্য সুবিধা, উপযুক্ত মজুরি, চাকরীর নিশ্চয়তা দান, কাজের সময়সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থনীতির জ্ঞান তাদেরকে সাহায্য করে।
- ৮। সমাজকর্মীদের নিকট :** অভাববোধ থেকেই অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি। দারিদ্র্য, শিক্ষাবৃত্তি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বেকারত্ব প্রভৃতি সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর কারণ জানা এবং এসবের সমাধানের পথ বের করার জন্য সমাজকর্মীদের অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের জন্য অর্থনীতির জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সারসংক্ষেপ

- দৈনন্দিন জীবনে স্বল্পতার সমস্যা বুঝতে এবং এর সমাধানের চেষ্টায় অর্থনীতির জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।
- শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নিকট অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য।
- দেশের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। অর্থনীতির জ্ঞান এ কাজে সাহায্য করে।
- সমাজকর্মীদের অর্থনীতির জ্ঞান থাকলে নানা প্রকার সামাজিক সমস্যা বুঝতে সহজ হয় এবং সে অনুসারে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কি তা বলতে পারবেন।
- এ সমস্যা কিভাবে সমাধান করা সম্ভব তা আলোচনা করতে পারবেন।
- কেন আমাদের সম্পদের অপচয় কমাতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশ দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, খাদ্য ঘাটতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, স্বল্প মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত। এসব সমস্যা সমাধান করে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি বৃদ্ধি করতে হবে। এ জন্য অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য। নিচে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল।

১। মিতব্যয়িতা শিক্ষাদান : বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এখানে অধিকাংশ মানুষ অভাবের মধ্যে কোনভাবে দিন যাপন করে। আমাদের সম্পদ সীমিত। সে জন্য সবাইকে মিতব্যয়ী হতে হবে। মানুষ মিতব্যয়ী হলে সে তার অসীম অভাব সীমিত সম্পদ দিয়ে মেটাতে পারে। অতএব মিতব্যয়িতা অভ্যাসের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা লাভের জন্য এদেশের মানুষের কাছে অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

২। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান : দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য ঘাটতি, অনুন্নত কৃষি, শিল্পের অনগ্রসরতা, অনুন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। আমাদের সমস্যা প্রচুর কিন্তু সম্পদ সীমিত। তাই এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার অপরিহার্য। এ কাজে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর শিক্ষিত জনগণের দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হলে অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োজন। সীমিত সম্পদের সাহায্যে দেশের উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় প্রভৃতি কাজ কিভাবে সম্পাদন করলে মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি পায় তা অর্থনীতি পাঠে জানা যায়।

৩। অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি : অর্থনৈতিক অবস্থা থেকেই সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। অর্থনীতি পাঠ মানুষকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে। এটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তাই এক্ষেত্রে অর্থনীতি পাঠের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা চিহ্নিত করা এবং এর সঠিক সমাধানের জন্য অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনীতি পাঠ আমাদের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং এর সমাধান খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। তাই এ দেশের প্রতিটি নাগরিকের অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। অর্থনীতি পাঠ এ দেশের মানুষকে কিভাবে সাহায্য করে?
 - ক. জ্ঞান বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত হতে সাহায্য করে
 - খ. আমাদের সমস্যা চিহ্নিত এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করে
 - গ. সম্পদ বৃদ্ধি এবং অভাব সম্পর্কে সচেতন করে
 - ঘ. মানুষের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে সচেতন করে

২। অর্থনীতি মানুষের কোন বিষয়টি জাগ্রত করে?

- ক. শিল্পবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ খ. ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ
গ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ঘ. অভাববোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ১.১ : ১। গ ; ২। খ ; ৩। ক ; ৪। ঘ ; ৫। ক।

অনুশীলনী ১.২ : ১। খ ; ২। ক ; ৩। ক ;

অনুশীলনী ১.৩ : ১। খ ; ২। গ।

ব্যবহৃত শব্দ সম্ভার :

- অভাব : কোন দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অভাব বলে।
 দ্রব্য : যেসব বস্তু মানুষের অভাব পূরণ করে তাকে দ্রব্য বলে।
 উপযোগ : দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।
 উৎপাদন : মানুষ প্রকৃতি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তাকে অভাব মোচনের উপযোগী করে নেয়। এই উপযোগী করে নেওয়াই হল উৎপাদন। অর্থাৎ উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি করাকেই বুঝায়।
 ভোগ : উপযোগের ব্যবহারকে ভোগ বলে।
 সম্পদ : যেসব দ্রব্যের আর্থিক মূল্য আছে তাকে সম্পদ বলে।
 চাহিদা : কোন দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, সেই দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা এবং উহা ক্রয় করার ইচ্ছাকে চাহিদা বলে।
 বিনিময়মূল্য : কোন দ্রব্যের বিনিময়মূল্য বলতে ঐ দ্রব্যের বদলে অন্য দ্রব্য পাওয়ার ক্ষমতাকে বুঝায়।
 জাতীয় আয় : একটি নির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ এক বছরে) একটি দেশে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে।
 বন্টন : দেশের মোট জাতীয় আয়কে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে ভাগ করে দেওয়াকে বন্টন বলে।
 অর্থনৈতিক উন্নয়ন : অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে একটি দেশের সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাকে বুঝায়।

ইউনিট ২

সম্পদ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

ভূমিকা

উর্বর জমি, বনজ, খনিজ, প্রাণিজ, পানি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ। এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে পারি। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ পৃথিবীর সম্পদকে কেন্দ্র করে তার অর্থনৈতিক কাজকর্ম গড়ে তুলেছে। সম্পদ মানুষের অভাব পূরণ ও সুখ-স্বাস্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যে দেশে সম্পদ যত বেশি সে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা তত বেশি। তবে প্রাকৃতিক সম্পদ কম থাকলেও একটা দেশ মানব সম্পদে উন্নত হলে তার সাহায্যে অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মকুশলতা, আন্তরিকতা, উদ্যোগ প্রভৃতির সাহায্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে জাপানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা জাপান একটি উন্নত দেশ, অথচ এর প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ খুব কম। সুতরাং সম্পদ কাকে বলে, আমাদের দেশে কি কি সম্পদ আছে এবং সেগুলোর যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে কিনা, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তা সবার জন্য প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে সম্পদ কি, প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে খনিজ, প্রাণিজ ও পানি সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

পাঠ ১ : সম্পদের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- সম্পদ কি তা বলতে পারবেন।
- বস্তুজাত দ্রব্য ও অবস্তুজাত দ্রব্য বা সেবার পার্থক্য বলতে পারবেন।
- সম্পদের কয়টি বৈশিষ্ট্য আছে তা বলতে পারবেন।

সম্পদ কি

সাধারণত সম্পদ বলতে আমরা টাকাপয়সা বা ধনসম্পত্তিকে বুঝে থাকি। কিন্তু অর্থনীতিতে সম্পদ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। যে দ্রব্য মানুষের অভাব পূরণ করে এবং যার যোগান অপ্রতুল (অর্থাৎ যা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না) তাকে সম্পদ বলে। এ অর্থে সব অর্থনৈতিক দ্রব্যকে (যে সব দ্রব্যের বিনিময় মূল্য আছে) সম্পদ বলে। অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে বাজারে যা কেনা বেচা হয় তাই সম্পদ। যেমন— আপনার লেখার কলমটির কথাই ধরুন। এটি পাওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই মূল্য দিতে হবে। সুতরাং এটি একটি সম্পদ।

সম্পদ বস্তুজাত দ্রব্য হতে পারে আবার অবস্তুজাত দ্রব্যও হতে পারে। যে সব বস্তু দেখা যায় ও স্পর্শ করা যায় তাকে বস্তুজাত দ্রব্য বলে। যেমন— চেয়ার, টেবিল, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি। যে সব বস্তু দেখা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না অথচ তার ব্যবহার মানুষের অভাব পূরণে সহায়তা করে তাকে অবস্তুজাত দ্রব্য বা সেবা বলে। যেমন— শিক্ষকের শিক্ষকতা, নার্সের সেবা, ব্যবসায়ের সুনাম, গায়কের গান ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অর্থের বিনিময়ে যে সব বস্তুজাত বা অবস্তুজাত দ্রব্য কেনা-বেচা করা যায় তাদেরকে সম্পদ বলে।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য

সম্পদের বৈশিষ্ট্য চারটি, যথা—

- উপযোগ,
- অপ্রাচুর্য,
- হস্তান্তরযোগ্যতা ও
- বহিরাবস্থান বা বাহ্যিকতা।

এ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

উপযোগ : উপযোগ হচ্ছে দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতা। কোন দ্রব্যের উপযোগ না থাকলে তাকে সম্পদ বলা যায় না। কারণ উপযোগ না থাকলে কোন দ্রব্যের অর্থমূল্য থাকে না। যেমন পচা ডিমের উপযোগ নেই। তাই এটা কেউ অর্থ দিয়ে কিনবে না।

অপ্রাচুর্য : শুধুমাত্র দ্রব্যের উপযোগ থাকলেই তাকে সম্পদ বলা যাবে না। দ্রব্যটির যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হতে হবে। কারণ যে সব দ্রব্য অবাধলভ্য তাদের অর্থমূল্য থাকে না। যেমন— সূর্যের আলো, মাঠের বাতাস, নদীর পানি প্রভৃতি বিনামূল্যে পাওয়া যায় বলে এগুলো সম্পদ নয়। তবে স্থানভেদে কোন দ্রব্য সম্পদ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। যেমন— নদীতে পানি অবাধলভ্য। তাই এ পানি সম্পদ নয়। কিন্তু শহরে যে পানি সরবরাহ করা হয় তার জন্য আমরা দাম দেই। এ পানি সম্পদ।

হস্তান্তরযোগ্যতা : হস্তান্তর বলতে দ্রব্যের স্থানান্তর বা মালিকানার পরিবর্তন বুঝায়। যে বস্তু হস্তান্তর করা যায় না তা কেউ কিনে ব্যবহার করতে পারবে না। যেমন জমি একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়া যায় না। কিন্তু এর মালিকানা পরিবর্তন করা যায়। তাই জমি সম্পদ। কিন্তু কোন কবির প্রতিভা হস্তান্তর করা যায় না। তাই এটা সম্পদ নয়।

বাহ্যিকতা : মানুষের গুণাবলী হস্তান্তর করা যায় না বলে এগুলো সম্পদ নয়। যেমন— স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে তার স্বাস্থ্য বিক্রি করতে পারে না। খেলোয়াড় তার ক্রীড়া নৈপুণ্য বিক্রি করতে পারে না। সুতরাং এগুলো ব্যক্তিগত গুণ, সম্পদ নয়। শুধু বাহ্যিক বা বাইরের পদার্থ যা অর্থের বিনিময়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে অপর এক ব্যক্তি নিতে পারে তাই সম্পদ। যেমন— চাল, ডাল, বাড়ি-ঘর, ব্যবসায়ের সুনাম ইত্যাদি। তাহলে বলা যায়, **যে বস্তুর উপযোগ, অপ্রাচুর্য, হস্তান্তরযোগ্যতা এবং বাহ্যিকতা এই চারটি গুণ আছে তাকে সম্পদ বলে।** এখানে মনে রাখতে হবে চারটি বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটির অভাব হলে কোন দ্রব্যকে সম্পদ বলা যাবে না।

সারসংক্ষেপ

- যে সব দ্রব্যের অর্থমূল্য আছে অর্থাৎ বাজারে কেনা-বেচা হয় তাই সম্পদ।
- সম্পদের চারটি বৈশিষ্ট্য : (১) উপযোগ, (২) অপ্রাচুর্য, (৩) হস্তান্তরযোগ্যতা এবং (৪) বাহ্যিকতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। নিচের কোনটি সম্পদ নয়?

ক. নদীর পানি	খ. জমি
গ. ব্যবসায়ের সুনাম	ঘ. আসবাবপত্র
- ২। অর্থনীতিতে হস্তান্তরযোগ্যতার অর্থ কি?

ক. স্থান পরিবর্তন	খ. মূল্য পরিবর্তন
গ. পরিমাণ পরিবর্তন	ঘ. মালিকানা পরিবর্তন
- ৩। মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ সম্পদ নয় কেন?

ক. উপযোগ কম বলে	খ. হস্তান্তরযোগ্য নয় বলে
গ. দুষ্প্রাপ্য বলে	ঘ. মূল্য নির্ধারণ করা যায় না বলে।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। সম্পদ কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য কয়টি ও কি কি?
- ২। সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। সম্পদের সংজ্ঞা লিখুন।

পাঠ ২ : সম্পদের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবিক সম্পদ ও মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় তা বলতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত সম্পদ, সমষ্টিগত সম্পদ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পদ কি তা বলতে পারবেন।

সাধারণত সম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

- প্রাকৃতিক সম্পদ,
- মানবিক সম্পদ ও
- মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ।

প্রাকৃতিক সম্পদ : প্রকৃতিতে যেসব বস্তু স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। অন্যভাবে বলা যায় প্রকৃতির দানই হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। মানুষের দৈনন্দিন অভাব পূরণে এদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে— জমি, পানি, জলবায়ু, গাছ-পালা, পশু-পাখি, বিভিন্ন ধরনের খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি।

মানবিক সম্পদ : মানুষের অভ্যন্তরীণ বা ভিতরের গুণাবলীকে মানবিক সম্পদ বলে। যেমন— স্বাস্থ্য, দক্ষতা, বুদ্ধি, উদ্যোগ, সততা ইত্যাদি মানবিক সম্পদ। বাহ্যিক সত্তা নেই বলে অর্থনীতিতে অবশ্য এদের সম্পদ বলে না। তবে মানবিক সম্পদ ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার সম্ভব নয়।

মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ : প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক সম্পদ একসাথে ব্যবহারের ফলে মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ সৃষ্টি হয়। যেমন— মানুষের শ্রম ও প্রকৃতি প্রদত্ত লোহার সাহায্যে সৃষ্টি হয় যন্ত্রপাতি, ঘর-বাড়ি, যানবাহন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি। এগুলো মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ। মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ যখন বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে পুঁজি বা মূলধন বলে।

মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

- ব্যক্তিগত সম্পদ,
- সমষ্টিগত সম্পদ,
- জাতীয় সম্পদ এবং
- আন্তর্জাতিক সম্পদ।

ব্যক্তিগত সম্পদ : কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সমস্ত সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলে। যেমন— ব্যক্তি বিশেষের ঘর-বাড়ি, গাড়ি, কারখানা ইত্যাদি।

সমষ্টিগত সম্পদ : যে সব সম্পদের মালিকানা সমাজের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে সমষ্টিগত সম্পদ বলে। জনগণের ব্যবহৃত সম্পদ এবং সরকারি সম্পদ একত্রে মিলে যে সম্পদ তাই সমষ্টিগত সম্পদ। যেমন— রাস্তাঘাট, রেলপথ, পার্ক, হাসপাতাল ইত্যাদি। এ সব সম্পদের উপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

জাতীয় সম্পদ : কোন দেশের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদকে একত্রে জাতীয় সম্পদ বলে। জনগণের সুনাম, কারিগরি দক্ষতা, খনিজ সম্পদ, একটি দেশের মোট উৎপাদন ইত্যাদি জাতীয় সম্পদের মধ্যে ধরা হয়। জাতীয় সম্পদ হিসাব করার সময় বিদেশের কাছে দেশের যে পাওনা তা যোগ করতে হয়। আর বিদেশের কাছে দেশের যে ঋণ থাকে তা বাদ দিতে হয়।

আন্তর্জাতিক সম্পদ : যে সব সম্পদ কোন বিশেষ একটি দেশের মালিকানাধীন নয় এবং যা পৃথিবীর সব দেশ ভোগ করতে পারে তাই আন্তর্জাতিক সম্পদ। যেমন— সাগর, মহাসাগর, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি।

সম্পদ ও কল্যাণ

সম্পদ হচ্ছে অর্থনৈতিক দ্রব্যসামগ্রী। আর এসব দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করে মনে যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তৃপ্তি পাওয়া যায় তাই হচ্ছে কল্যাণ। অভাব পূরণের উপর কল্যাণ নির্ভরশীল। সম্পদ অভাব পূরণের অন্যতম উপাদান কিন্তু সম্পদ নয় এমন অনেক জিনিসও মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যেমন— সূর্যের আলো, প্রকৃতির বাতাস, গ্লোহ, ভালোবাসা

ইত্যাদি। আবার কিছু দ্রব্য আছে (যেগুলো সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়) যা কল্যাণ না বাড়িয়ে বরং মানুষের ক্ষতি করে। যেমন— মদ, সিগারেট প্রভৃতি নেশা জাতীয় দ্রব্য। সম্পদ কিভাবে উপার্জিত হয় এবং কিভাবে ব্যবহার করা হয় তার দ্বারা কল্যাণ প্রভাবিত হয়।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ, খনিজ, পানি সম্পদ ও শক্তি সম্পদ এদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এগুলোর মধ্যে কৃষিজ, বনজ ও শক্তি সম্পদ (পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য জ্বালানী) সম্পর্কে আপনাদের বইয়ের ভূগোল অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এই ইউনিটে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

সারসংক্ষেপ

- সাধারণভাবে সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১. প্রাকৃতিক সম্পদ, ২. মানবিক সম্পদ ও ৩. মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ।
- মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়—: ১. ব্যক্তিগত সম্পদ, ২. সমষ্টিগত সম্পদ, ৩. জাতীয় সম্পদ ও ৪. আন্তর্জাতিক সম্পদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। কোনটি ব্যক্তিগত সম্পদ ?

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	খ. ঘর-বাড়ি
গ. হাসপাতাল	ঘ. ডাকঘর
- ২। মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ২ ভাগে	খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে	ঘ. ৫ ভাগে
- ৩। কোনটি সমষ্টিগত সম্পদ?

ক. জমি	খ. আসবাবপত্র
গ. ব্যবসায়ের সুনাম	ঘ. চিড়িয়াখানা
- ৪। জাতীয় সম্পদ কাকে বলে?

ক. দেশের সকল ব্যক্তিগত সম্পদের সমষ্টি
খ. দেশের সমষ্টিগত সম্পদের যোগফল
গ. দেশের সকল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদের যোগফল
ঘ. সরকারি মালিকানাধীন সকল সম্পদ
- ৫। কোনটি মানবিক সম্পদ?

ক. আবহাওয়া	খ. পোশাক-পরিচ্ছদ
গ. দক্ষতা	ঘ. বনভূমি

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। প্রকৃতি অনুযায়ী সম্পদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় বর্ণনা করুন।
- ২। মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে কয়ভাবে ভাগ করা যায় আলোচনা করুন।

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় তা বলতে পারবেন।
- কোন কোন জায়গায় কি কি খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় তা বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে যে সকল খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় তার বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

কয়লা

শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। জ্বালানি হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া ও ফরিদপুর জেলায় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। অনুমান করা হচ্ছে শুধু বগুড়া জেলাতেই প্রায় ৭৫ কোটি টন কয়লা আছে। এ কয়লা উৎকৃষ্টমানের। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় উন্নতমানের কয়লা পাওয়া গেছে। এছাড়া সিলেট, খুলনা ও ফরিদপুর জেলায় প্রচুর পরিমাণে নিম্নমানের পীট কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক নয় বলে এসব খনি হতে কয়লা উত্তোলন এখনও শুরু হয়নি। সম্প্রতি দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় বিদেশী সহযোগিতায় কয়লা উত্তোলনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসই প্রধান। এটি একটি উৎকৃষ্ট জ্বালানি। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পে (যেমন— সার কারখানায়) কাঁচামাল হিসেবেও গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ১৭টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলোতে প্রায় ১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে।

খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম

খনিজ তেল শক্তির অন্যতম উৎস। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। তাই এখানে খনিজ তেল পাওয়ারও উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে এবং উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ খনিজ তেল রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। সম্প্রতি সিলেটের হরিপুরে স্বল্প পরিমাণ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে।

চূনাপাথর

সিমেন্ট, কাগজ, রিচিং পাউডার, রাসায়নিক দ্রব্য, সাবান, ইস্পাত, কাচ প্রভৃতি শিল্পে চূনাপাথর ব্যবহার করা হয়। সিলেটের বাগলিবাজার, জাফলং, জয়পুরহাট এবং চট্টগ্রামের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে চূনাপাথর পাওয়া গেছে।

সাদামাটি বা চীনামাটি

চীনামাটি মৃৎশিল্পে ব্যবহার করা হয়। ময়মনসিংহের বিজয়পুরে এবং রাজশাহীর পত্নীতলায় সাদামাটি পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের চাহিদার মোট ৫০ শতাংশ চীনামাটি বিজয়পুরের খনি হতে উত্তোলন করা হয়।

সিলিকা বালু

এটি কাচ, রং, অগ্নিরোধক ইট ও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও জামালপুরে সিলিকা বালু পাওয়া যায়।

তামা

রংপুরের রানীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সাথে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। বৈদ্যুতিক তার, বাসনপত্র ইত্যাদি তৈরিতে তামার প্রয়োজন হয়।

গন্ধক

রাসায়নিক শিল্প, বারুদ ও দিয়াশলাই তৈরি, তেল পরিশোধন প্রভৃতি কাজে গন্ধক ব্যবহার করা হয়। চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ায় গন্ধক পাওয়া গেছে।

পাঠ ৪ : বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ ও পানি সম্পদ

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগি আমাদের অর্থনীতিকে কিভাবে সাহায্য করে তা বলতে পারবেন।
- এদেশে কত কিলোমিটার নদীপথ আছে তা বলতে পারবেন।
- কি কি কাজে পানি সম্পদ ব্যবহার করা হয় তা বলতে পারবেন।

প্রাণিজ সম্পদ

বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

- গবাদিপশু,
- হাঁস-মুরগি ও
- মৎস্য।

গবাদিপশু বলতে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বুঝায়। আমাদের দেশে যন্ত্রের সাহায্যে চাষের কাজ এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। কৃষিকাজ বহুলাংশে গরু, মহিষ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। যানবাহন ও মালপত্র পরিবহনের কাজেও গবাদিপশু ব্যবহার করা হয়। গরু-মহিষ হতে আমরা দুধ ও মাংস পেয়ে থাকি। ছাগল ও ভেড়া মূলত আমাদের মাংসের প্রয়োজন মেটায়। গবাদি পশুর চামড়া রপ্তানি করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকি। হাঁস-মুরগী আমাদের ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ করে। এসব পশু-পাখি জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দিয়ে থাকে। পশু ও হাঁস-মুরগি পালন করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে। এ উদ্দেশ্যে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার তৈরির জন্য সরকার জনগণকে নানাভাবে উৎসাহিত করছে, আর্থিক সহায়তাও দিচ্ছে।

প্রাণিজ সম্পদের মধ্যে মৎস্য এ দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণে মাছের অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে প্রাণিজাত আমিষের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই আসে মাছ থেকে। এ দেশে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর ও পুকুর। তছাড়া বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বিরাট মৎস্য চারণক্ষেত্র। এসব এলাকায় আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে পারলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও মাছ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, খাদ্য ঘাটতি পূরণ ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতি সাধন করা যাবে। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকার মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। তছাড়া, দেশে বেশ কয়েকটি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র, আধুনিক মৎস্য চাষ ও উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত আছে।

পানি সম্পদ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য নদী-নালা এ দেশে জলের মত ছড়িয়ে আছে। পানি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বিভিন্ন কাজে আমাদের পানির প্রয়োজন। দৈনন্দিন প্রয়োজন ছাড়াও কৃষিকাজ, নৌ চলাচল, মৎস্য চাষ ও পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পানি ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের কৃষিকাজ পানি সম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রতি বছর বর্ষাকালে নদীর পানি পলিমাটি বহন করে। এতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ফসল ভাল হয়। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের খাদ্য সমস্যা প্রকট হচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়। জলাসেচের প্রসারের মাধ্যমে আমরা একই জমিতে বছরে দুই বা তিনবার ফসল উৎপাদন করতে পারি। সুতরাং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি।

নদীবহুল এই দেশ। এ দেশে প্রায় ৭০৪০ কিলোমিটার নাব্য নদীপথ আছে। সারা বছর ৪৮০০ কিলোমিটার নদীপথ নাব্য থাকে। বাংলাদেশের জলপথ যাতায়াত ও মালপত্র পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম। নদীপথে অসংখ্য যাত্রী চলাচল করে এবং বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী পরিবহন করা হয়। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। কিন্তু পলি পড়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে নদীপথ ক্রমশ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। তাই জরুরি ভিত্তিতে নদীগুলোকে খননের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশে মৎস্যচাষ এবং এর উৎপাদন বৃদ্ধিতেও পানি সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ দেশের অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ে পরিকল্পিত উপায়ে মাছ চাষ করে মাছের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এতে একদিকে আমিষের প্রয়োজন মিটবে, আবার মাছ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের পানি সম্পদ বিশেষ অবদান রাখতে পারে। শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ। নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে চট্টগ্রামের কাগুই-এ একটি পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে।

শিল্প কারখানা স্থাপন, নগরায়ন এবং জমিতে সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের ফলে নদ-নদী, খাল-বিলের পানি দূষিত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সারসংক্ষেপ

- প্রাণিজ ও পানি-সম্পদ বাংলাদেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।
- এ দেশের প্রাণিজ সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (১) গবাদিপশু, (২) হাঁস-মুরগি ও (৩) মৎস্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে
- ২। বাংলাদেশে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কয়টি?
ক. ১ টি খ. ২ টি
গ. ৩ টি ঘ. ৪ টি
- ৩। বাংলাদেশে কত কিলোমিটার নাব্য নদীপথ আছে?
ক. ৫০৮০ কিলোমিটার খ. ৬০৪০ কিলোমিটার
গ. ৭০৪০ কিলোমিটার ঘ. ৮০৪০ কিলোমিটার
- ৪। বাংলাদেশের প্রাণিজাত আমিষের শতকরা কত ভাগ মাছ হতে আসে?
ক. ৫০ ভাগ খ. ৬০ ভাগ
গ. ৭০ ভাগ ঘ. ৮০ ভাগ

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
- ২। বাংলাদেশের পানি সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ২.১ : ১. ক, ২. ঘ, ৩. খ।

অনুশীলনী ২.২ : ১. খ, ২. গ, ৩. ঘ, ৪. গ, ৫. গ।

অনুশীলনী ২.৩ : ১. গ, ২. ঘ, ৩. গ, ৪. ক, ৫. ক, ৬. গ।

অনুশীলনী ২.৪ : ১. খ, ২. ক, ৩. গ, ৪. ঘ।

ইউনিট ৩

উপযোগ ও ভোগ

ভূমিকা

অর্থনীতি বিষয়টি ভালভাবে বুঝার জন্য কতকগুলো মৌলিক ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। উপযোগ এবং ভোগ এমন দু'টি ধারণা যা মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। উপযোগ সৃষ্টি বা উৎপাদনকে কেন্দ্র করেই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মানুষের কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো ভোগ ও তৃপ্তি। একজন ক্রেতা কেন দ্রব্য ক্রয় করে, এর উত্তর জানতে হলে উপযোগ ও ভোগের ধারণা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। এ সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

পাঠ ১ : সংজ্ঞা, মোট ও প্রান্তিক উপযোগ

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- উপযোগ কি তা বলতে পারবেন।
- মোট ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

উপযোগ কাকে বলে?

আপনি অর্থনীতির এই বইটি পড়ছেন। কারণ বইটি থেকে আপনি উপকারিতা পাচ্ছেন। আর সাধারণভাবে ‘উপযোগ’ বলতে কোন জিনিসের এ ধরনের উপকারিতাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে ‘উপযোগ’ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন দ্রব্যের মধ্যে মানুষের কোন অভাব পূরণ করার যে ক্ষমতা বা গুণ থাকে তাকে ‘উপযোগ’ বলা হয়। যে কোন দ্রব্য বস্তুগত বা অবস্তুগত যাই হোক, মানুষের অভাব মেটাতে পারলেই বুঝতে হবে যে তার উপযোগ আছে। যেমন, ভাত আমাদের ক্ষুধা মেটায়। সূতরাং ভাতের উপযোগ আছে। এখন প্রশ্ন হল, মানুষ কেন দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে? মানুষ তার অভাব মিটিয়ে তৃপ্তি লাভের জন্য দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে।

যে দ্রব্য মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে না, সে দ্রব্য মানুষ কিনবে না। যেমন— একজন ক্রেতা বাজারে গিয়ে কখনই পচা ডিম বা মাছ কিনবেন না। কারণ এগুলো তার কোন অভাব পূরণ করতে পারছে না। অর্থাৎ এগুলোর কোন উপযোগ নেই। অর্থনীতিতে দ্রব্যের উপযোগের সাথে নৈতিকতা, ভাল কি মন্দ, উচিত কি অনুচিত তার কোন সম্পর্ক নেই। মাদকদ্রব্য ক্ষতিকর কিন্তু যদি মানুষ এ দিয়ে তার অভাব মেটাতে পারে তবে এরও উপযোগ আছে। কোন দ্রব্যের জন্য কারও কাছে উপযোগ থাকতে পারে আবার কারও কাছে না থাকতে পারে। যেমন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে মাদক দ্রব্যের উপযোগ আছে কিন্তু যিনি নেশায় আসক্ত নন তার কাছে মাদক দ্রব্যের কোন উপযোগ নেই।

সময়, ব্যক্তি, অবস্থান বা স্থানভেদে উপযোগের তারতম্য ঘটে। যেমন— অশিক্ষিত লোক অপেক্ষা শিক্ষিত লোকের কাছে বই-এর উপযোগ অধিক। গরম পানির উপযোগ গরমকালের তুলনায় শীতকালে বেশি।

উপযোগ একটি মানসিক অনুভূতি যা অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। তবে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্শালের মতে উপযোগ অর্থের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। কোন জিনিসের উপযোগ বেশি না কম তা আমরা কিভাবে জানব? **কোন ক্রেতার কাছে যে দ্রব্যের উপযোগ বেশি ঐ দ্রব্যের জন্য সে বেশি দাম দিতে ইচ্ছুক।** আর যদি সে কম দাম দিতে ইচ্ছুক হয় তবে ধরে নিতে হবে তার কাছে ঐ দ্রব্যের উপযোগ কম। এভাবে অর্থ বা দাম দ্বারা উপযোগ পরিমাপ করা যায়। অবশ্য অর্থের মাধ্যমে উপযোগ পরিমাপের অসুবিধা এই যে, অর্থের উপযোগই সবার কাছে সমান নয়। অর্থের উপযোগ ধনী অপেক্ষা গরিবের কাছে বেশি।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ

উপযোগের ধারণাকে আরও ভালভাবে বুঝার জন্য আমরা আলোচনাটিকে মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ এ দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। **কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে যে বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যায় তাদের যোগফলকে মোট উপযোগ বলা হয়।** অন্যদিকে **কোন দ্রব্যের শেষ একক থেকে যে উপযোগ পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক**

উপযোগ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ একজন বালকের কমলালেবু খেতে খুব ইচ্ছে হল। সে হয়ত বাজারে গিয়ে ৪ টাকা দিয়ে একটি কমলালেবু কিনল। কারণ, ঐ কমলালেবু হতে সে ৪ টাকার সমান উপযোগ পাবে বলে মনে করছে। তাই প্রথম কমলালেবু থেকে ৪ টাকার সমান প্রাস্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগ লাভ করে। প্রথম কমলালেবুটি খাওয়ার পর তার দ্বিতীয় কমলালেবুটি খাবার ইচ্ছা প্রথম কমলালেবু খাবার ইচ্ছা অপেক্ষা কম হবে। সে দ্বিতীয় কমলালেবু কেনার জন্য ৩ টাকা দিতে রাজি হতে পারে। সুতরাং বালকটি যখন দ্বিতীয় কমলালেবু ক্রয় করে তখন সে ৩ টাকার প্রাস্তিক উপযোগ লাভ করে। দ্বিতীয় কমলালেবু খাওয়ার পর তৃতীয় কমলালেবু কিনতে বললে সে হয়ত ২ টাকায় পেলে কিনতে রাজি হবে। সুতরাং বালকটি যখন তৃতীয় কমলালেবু ক্রয় করে তখন সে ২ টাকার সমান প্রাস্তিক উপযোগ লাভ করে। এভাবে সে যতই কমলালেবু কিনতে থাকবে তার কমলালেবু পাবার ইচ্ছাও ক্রমশ কমে থাকবে। উপরের উদাহরণে ৩টি কমলালেবু থেকে বালকটির মোট উপযোগ হল $৪+৩+২$ বা ৯ টাকার সমান। সুতরাং মোট উপযোগ = ১ম একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ + ২য় একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ + ৩য় একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ।

মোট ও প্রাস্তিক উপযোগের সম্পর্ক :

কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগের ফলে মোট উপযোগ যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকেই প্রাস্তিক উপযোগ বলে। উপরের উদাহরণে দেখা যায় যে, একটি বালক তিনটি বা **তিন একক** কমলালেবু কিনে। তৃতীয় একক কমলালেবু ক্রয়ের পর আর কমলালেবু ক্রয় করে না, কারণ তার কমলালেবু খাওয়ার উপযোগ শেষ হয়েছে। এখানে তৃতীয় একক থেকে যে উপযোগ পাওয়া যায় তাই প্রাস্তিক উপযোগ। তাই তৃতীয় এককটি **প্রাস্তিক একক**। এখানে বালকটির প্রাস্তিক উপযোগ ২ টাকার সমান।

কোন দ্রব্যের বিভিন্ন একক পর পর ভোগ বা ব্যবহার করতে থাকলে প্রত্যেক একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু সকল একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি বা মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে প্রাস্তিক উপযোগ যখন শূন্য হয় তখন মোট উপযোগ সর্বেচ্ছি হয়। নিচের সারণির সাহায্যে মোট উপযোগ এবং প্রাস্তিক উপযোগের ধারণাটি প্রকাশ করা যায় :

সারণী

কমলালেবুর একক	মোট উপযোগ (টাকার হিসাবে)	প্রাস্তিক উপযোগ (টাকার হিসাবে)
১ম একক	৪	৪
২য় একক	৭	৩
৩য় একক	৯	২
৪র্থ একক	৯	০

সারসংক্ষেপ

- কোন দ্রব্যের মধ্যে মানুষের কোন অভাব পূরণের যে ক্ষমতা বা গুণ থাকে তাকে উপযোগ বলে। দ্রব্য ও সেবা উভয়েরই উপযোগ আছে, তবে দ্রব্য বস্তুগত কিন্তু সেবা অবস্তুগত। অর্থনীতিতে দ্রব্যের উপযোগের সাথে নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই।
- কোন দ্রব্য বা সেবার বিভিন্ন একক থেকে যে বিভিন্ন উপযোগ পাওয়া যায় তাদের যোগফলকে মোট উপযোগ বলে। কোন দ্রব্যের শেষ একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগকে প্রাস্তিক উপযোগ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- উপযোগ কাকে বলে?
 - দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতাকে
 - মানুষের অভাব মেটাবার ক্ষমতাকে
 - উৎপাদিত দ্রব্যসমূহকে
 - দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষমতাকে।

- উপযোগ কিসের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়?

- ক. ভোগের মাধ্যমে
- খ. তৃপ্তির মাধ্যমে
- গ. অর্থের মাধ্যমে
- ঘ. শ্রমের মাধ্যমে

৩। মোট উপযোগ কাকে বলে?

- ক. সর্বশেষ এককের উপযোগ
- খ. সবগুলো এককের উপযোগের যোগফল
- গ. সর্বপ্রথম এককের উপযোগ
- ঘ. এককসমূহের গড় উপযোগ

৪। প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে?

- ক. সর্বমোট উপযোগ
- খ. প্রথম এককের উপযোগ
- গ. সর্বশেষ এককের উপযোগ
- ঘ. উপযোগের সমষ্টি।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। উপযোগ বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করুন।
- ২। মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ কি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। উপযোগের সংজ্ঞা দিন।

পাঠ ২ : মোট উপযোগ ও প্রাস্তিক উপযোগের সম্পর্ক, প্রাস্তিক উপযোগ ও দাম

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- দাম কি তা বলতে পারবেন।
- প্রাস্তিক উপযোগ ও দামের মধ্যে সম্পর্ক বলতে পারবেন।

প্রাস্তিক উপযোগ ও দাম :

উপযোগ সম্বন্ধে আপনি পূর্বেই জেনেছেন। এবার আসুন দাম কি সে সম্পর্কে কিছু জেনে নিই। অর্থনীতিতে দাম বলতে বিনিময় মূল্যকে বুঝায়। অর্থাৎ কোন দ্রব্যের বিনিময় মূল্যকে অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে তাকে দাম বলে। দামের সাহায্যেই উপযোগ পরিমাপ করা হয়। কোন দ্রব্য ভোগ করে মানুষ যে পরিমাণ উপযোগ লাভ করে, সে ঠিক ঐ পরিমাণ অর্থ দিতে প্রস্তুত থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তি ১ কেজি চাউলের জন্য যদি ১০ টাকা দিতে প্রস্তুত থাকে তাহলে ধরা যায় যে, সে ১ কেজি চাউল থেকে ১০ টাকার সমান উপযোগ লাভ করে। এভাবে দামের মাধ্যমেই উপযোগ পরিমাপ করা হয়।

প্রাস্তিক উপযোগের সাথে দামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ভোগকারীর কাছে দ্রব্যের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রাস্তিক উপযোগ ও দাম হ্রাস পায়। ভোগকারী সে পর্যন্ত কোন দ্রব্য ক্রয় করবে যে পর্যন্ত দ্রব্যটির প্রাস্তিক উপযোগ তার প্রদত্ত দামের সমান হয়। অন্য কথায় দ্রব্যের দাম ও ভোক্তার প্রাস্তিক উপযোগ সমান হলে সে ঐ দামে দ্রব্যটি ক্রয় করবে। যখন প্রাস্তিক উপযোগ অপেক্ষা দাম বেশি হবে ভোক্তা ঐ দ্রব্যটি ক্রয় করবে না। দাম যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাস্তিক উপযোগের কম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করতে থাকবে। ফলে বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দামের চেয়ে কম দামে দ্রব্য বিক্রয় করবে না। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে, বিক্রেতাকে দ্রব্য উৎপাদনে খরচ করতে হয়। বিক্রেতার নিকট গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন দাম ও ক্রেতার প্রাস্তিক উপযোগ যেখানে সমান সেখানেই দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। ধারণাটি নিচের সারণির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সারণী

কমলালেবুর সংখ্যা	মোট উপযোগ (টাকার হিসাবে)	প্রাস্তিক উপযোগ (টাকার হিসাবে)	বাজার দর (টাকার হিসাবে)
১	৪	৪	২
২	৭	৩	২
৩	৯	২	২
৪	১০	১	২

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ১ম কমলালেবুর প্রাস্তিক উপযোগ ৪ টাকার সমান বলে ক্রেতা ১ম কমলালেবুর জন্য ৪ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু বাজারে যদি কমলালেবুর দাম ২ টাকা হয় তবে ক্রেতা মনে করেন যে, তিনি অধিক সংখ্যক কমলালেবু কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করবেন। এভাবে ৩য় কমলালেবু ক্রয় করে দেখবেন যে, তার প্রাস্তিক উপযোগ ও বাজার দাম সমান। তিনি ৪র্থ কমলালেবু কিনতে ইচ্ছুক হবেন না। কারণ এখানে প্রাস্তিক উপযোগ দাম অপেক্ষা কম।

সারসংক্ষেপ

- কোন দ্রব্যের বিভিন্ন একক যখন ভোক্তা পর পর ভোগ করতে থাকে তখন প্রত্যেক একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ হ্রাস পেতে থাকে। তবে সকল এককের উপযোগের সমষ্টি বা মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে।
- কোন দ্রব্যের বিনিময় মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে দাম বলে।
- বিক্রেতার নিকট গ্রহণযোগ্য সর্বনিম্ন দাম ও ক্রেতার প্রাস্তিক উপযোগ যেখানে সমান সেখানেই দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক(✓) চিহ্ন দিন:

- ১। কখন প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়?
 ক. সবগুলো একক ভোগ করলে খ. আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হলে
 গ. উপযোগ বৃদ্ধি পেলে ঘ. উপযোগ হ্রাস পেলে
- ২। কখন মোট উপযোগ সর্বেচ্ছ হয়?
 ক. প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হলে খ. মোট উপযোগ বৃদ্ধি পেলে
 গ. প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পেলে ঘ. কোন দ্রব্য ভোগ করলে

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। প্রান্তিক উপযোগ ও দামের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩ : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি ও এর ব্যতিক্রম

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কি কি অনুমিত শর্তাবলীর উপর এই বিধিটি কার্যকর তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- একটি উদাহরণ দিয়ে বিধিটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিধিটির ব্যতিক্রম কি কি তা বলতে পারবেন।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

সাধারণভাবে মানুষের অভাবের কোন সীমা নেই, কিন্তু একটি বিশেষ দ্রব্যের অভাব সীমিত বা সসীম। মানুষ যখন কোন বিশেষ দ্রব্য ক্রমাগতভাবে পেতে থাকে বা ভোগ করতে থাকে তখন ধীরে ধীরে ঐ দ্রব্যের উপযোগ বা পাবার ইচ্ছা কমেতে থাকে। উপযোগের এই বিধিকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মার্শাল বলেন, “কোন বিশেষ দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধির ফলে কোন ব্যক্তি যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করে তা মজুদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কমেতে থাকে।” ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কতিপয় অনুমিত শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা হয়। এই শর্তসমূহ হল :

- ১। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিধিটি প্রযোজ্য হবে।
- ২। ভোগকালীন অবস্থায় ভোক্তার আয়, পছন্দ, রুচি ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকবে।
- ৩। দ্রব্যের এককসমূহ অভিন্ন জাতীয় হতে হবে।
- ৪। ভোগকারীকে স্বাভাবিক বিচার-বিবেচনা সম্পন্ন লোক হতে হবে।

নিচে সারণির সাহায্যে উদাহরণ দিয়ে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা করা হল :

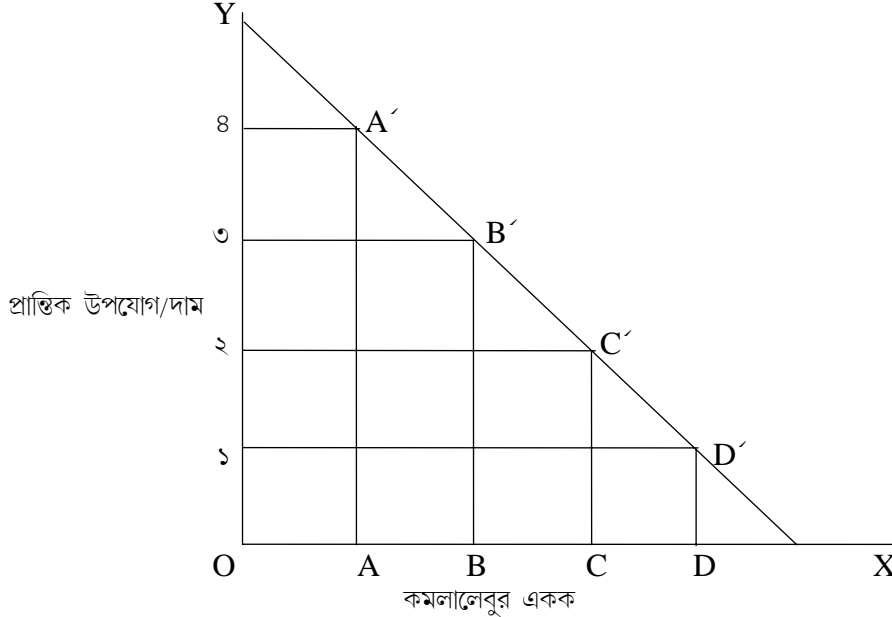
সারণি

কমলালেবুর একক (সংখ্যায়)	মোট উপযোগ (টাকার হিসেবে)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকার হিসেবে)
১	৪	৪
২	৭	৩
৩	৯	২
৪	৯	০

উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম কমলালেবু পাবার জন্য লোকটির খুব আগ্রহ ছিল। তিনি এজন্য ৪ টাকা দিতে রাজি আছেন। কারণ, তিনি প্রথম একক কমলালেবু থেকে ৪ টাকার সমান উপযোগ পাবেন বলে মনে করেন। প্রথমটি খাবার পর তাঁর কমলালেবু খাবার জন্য আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পাবে এবং তিনি দ্বিতীয় একক কমলালেবুর জন্য ৩ টাকা দিতে চাইবেন। কারণ দ্বিতীয় কমলালেবু থেকে ৩ টাকার সমান উপযোগ পাবেন বলে মনে করেন। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা আরও কমে যাওয়ায় তৃতীয় একক পাবার জন্য তিনি আরও কম অর্থাৎ ২ টাকা দিতে

রাজি হবেন। লোকটির কমলালেবু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এমনভাবে হ্রাস পাবে যে তিনি চতুর্থ এককের জন্য কোন অর্থ দিতে রাজি হবেন না। কারণ তার কাছে এর কোন উপযোগ নেই এবং মোট উপযোগ একই থাকবে। এ থেকে দেখা যায় যে, ভোগকারী কোন দ্রব্য যতই অধিক পরিমাণে ভোগ করেন ততই সে দ্রব্যের প্রাস্তিক উপযোগ হ্রাস পায় এবং মোট উপযোগ বাড়তে থাকলেও তা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ভোগের এই প্রবণতাকেই অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রাস্তিক উপযোগ বিধি বলে অভিহিত করা হয়।

লেখচিত্রের সাহায্যে বিধিটি ব্যাখ্যা করা হল :



চিত্রে OY রেখায় দাম বা প্রাস্তিক উপযোগ এবং OX রেখায় কমলালেবুর বিভিন্ন একক দেখানো হয়েছে।

ক্রমতঃ প্রথম কমলালেবু বা OA একক দ্রব্যের জন্য ৪ টাকা দিতে ইচ্ছুক এবং তিনি AA' পরিমাণ উপযোগ লাভ করেন। দ্বিতীয় কমলালেবু বা AB একক দ্রব্যের ক্রয়ের জন্য ক্রেতা ৩ টাকা দিতে ইচ্ছুক এবং এ থেকে তিনি BB' সমান উপযোগ লাভ করেন। তৃতীয় কমলালেবু বা BC একক দ্রব্যের জন্য ক্রেতা ২ টাকা দিতে ইচ্ছুক। কারণ এ থেকে তিনি CC' সমান উপযোগ পান। অনুরূপভাবে চতুর্থ কমলালেবুর বা CD একক দ্রব্যের জন্য ক্রেতা DD' সমান উপযোগ পেতে পারেন। এখন A', B', C', D' বিন্দুগুলো যোগ করে আমরা যে রেখা পাই তাই ক্রমহ্রাসমান প্রাস্তিক উপযোগ রেখা।

বিধিটির ব্যতিক্রম :

ক্রমহ্রাসমান প্রাস্তিক উপযোগ বিধিটির বাস্তব প্রয়োগে নিম্নরূপ ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায় :

- ১। **দ্রব্যটির একক :** দ্রব্যটির এককের পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। তা নাহলে বিধিটি কার্যকর হবে না। একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির কাছে এক চামচ পানির পর দ্বিতীয় চামচ পানির জন্য তার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেতে পারে।
- ২। **অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন :** একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস অপরিবর্তনীয় থাকতে হবে। তা না হলে বিধিটি কার্যকরী হতে পারবে না। কেননা, অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন ঘটলে ভোক্তার কাছে অতিরিক্ত এককের উপযোগ হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেতে পারে।
- ৩। **বিশেষ সময় :** এ বিধিটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য হয়— কোন একটি সময় জুড়ে নয়। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি আজ কমলালেবুর একটি একক এবং আগামীকাল আর একটি একক ভোগ করে তবে সেক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকরী হবে না। কারণ, দীর্ঘ সময়ের পরিসরে লোকটির কমলালেবু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না কমে বরং আরও বাড়তে পারে।
- ৪। **শখের দ্রব্য :** এমন কতকগুলো দ্রব্য আছে যা মানুষ শখের বসে সংগ্রহ করে। যেমন— ডাকটিকেট সংগ্রহ, পুরাতন মুদ্রা সংগ্রহ ইত্যাদি। এ সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে উপযোগ কখনও হ্রাস পায় না। এগুলো মানুষ যতই সংগ্রহ করে ততই তাঁর সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়।

৫। **পরিপূরক দ্রব্য** : কোন দ্রব্যের উপযোগ শুধু তার যোগানের উপর নির্ভর করে না। ঐ দ্রব্যটির বিকল্প বা পরিপূরক দ্রব্যের সরবরাহের উপরও নির্ভরশীল। যেমন— বাজারে চিনির দাম কমে গেলে এবং গুড়ের যোগান যদি বেশি থাকে তাহলে গুড়ের উপযোগ কমবে। কলমের যোগান বৃদ্ধি পেলে কালির উপযোগ বৃদ্ধি পাবে।

৬। **অনুকরণ প্রভাব** : মানুষ যেহেতু অনুকরণপ্রিয় তাই অন্যের ভোগ দেখে তা ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে। এক্ষেত্রে সেই একই দ্রব্যের প্রাস্তিক উপযোগ হ্রাস পায় না বরং বাড়ে।

কিন্তু উপরোল্লিখিত ব্যতিক্রম খুবই নগণ্য। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান প্রাস্তিক উপযোগ বিধিটি প্রযোজ্য।

সারসংক্ষেপ

- ভোক্তা যখন কোন বিশেষ দ্রব্য ক্রমাগতভাবে পেতে থাকে বা ভোগ করতে থাকে তখন আস্তে আস্তে ঐ দ্রব্যের উপযোগ বা পাবার ইচ্ছা কমতে থাকে, এটাই ক্রমহ্রাসমান প্রাস্তিক উপযোগ বিধি।

পঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। ক্রমহ্রাসমান প্রাস্তিক উপযোগ বিধি কি?
ক. কোন দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া
খ. বেশি দ্রব্য পেতে থাকলে ঐ দ্রব্যের উপযোগ কমতে থাকা
গ. সর্বশেষ একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ বেশি হওয়া
ঘ. সবগুলো একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ কমতে থাকা
- ২। ক্রমহ্রাসমান প্রাস্তিক উপযোগ বিধিটির অন্যতম ব্যতিক্রম কি?
ক. দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য খ. খাদ্যদ্রব্য
গ. শখের দ্রব্য ঘ. বিলাস দ্রব্য

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। ক্রমহ্রাসমান প্রাস্তিক উপযোগ বিধি কি? বিধিটি কি কি অনুমিত শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করা হয়।
- ২। ক্রমহ্রাসমান প্রাস্তিক উপযোগ বিধিটির ব্যতিক্রমগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪ : ভোগ ও তৃপ্তি

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ভোগ কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- তৃপ্তি কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভোগ ও তৃপ্তির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।

ভোগ :

আপনার বলপয়েস্ট কলমটির কথাই ধরুন। এটি আপনি ব্যবহার করতে পারছেন অর্থাৎ এর উপযোগ আছে। লেখা কাজটির মাধ্যমে আবার এটি এক সময়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং সাধারণভাবে ভোগ বলতে ব্যবহারের মাধ্যমে কোন দ্রব্য নিঃশেষ করা বা ধ্বংস করাকে বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোন বস্তু সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। অর্থনীতিতে ভোগ বলতে মানুষের অভাব মেটানোর জন্য দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ বা ধ্বংস করাকে বুঝায়। মানুষ উৎপাদনের মাধ্যমে যেমন উপযোগ সৃষ্টি করে তেমনি ভোগের মাধ্যমে উপযোগ নিঃশেষ করে। মানুষ অভাব মেটাতে দ্রব্যের সরাসরি ব্যবহার দ্বারা। যেমন— মানুষ ভাত খেয়ে ক্ষুধা মেটায়। এভাবে পরিবারের সদস্যগণ এক গামলা ভাত সকলে মিলে খেয়ে গামলার ভাত নিঃশেষ করে ফেলতে পারেন।

উপযোগ নষ্ট হলেই যে ভোগ হবে তা বলা যায় না। ধরুন, আপনার কাছ থেকে এক গ্লাস সরবত অসাধনতা বশত পড়ে গেল। একে কি ভোগ বলবেন? নিশ্চয়ই না। কারণ এতে সরবতের উপযোগ নষ্ট হল কিন্তু ভোগে এল না। একমাত্র ব্যবহারের দ্বারা কোন দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস হলে তাকে ভোগ বলা হয়। যেমন, একটি শাট বহুদিন ব্যবহার করে এর উপযোগ নিঃশেষ করা হয়, ব্যবহার করতে করতে এটা ব্যবহারের আর উপযোগী থাকে না। তখন জীর্ণ শাটটির ব্যবহার বন্ধ করা হয়। সুতরাং **মানুষের অভাব মেটানোর জন্য কোন দ্রব্য ব্যবহার করে এর উপযোগ নিঃশেষ করাকেই ভোগ বলা হয়।**

তৃপ্তি :

মানুষের অভাব মেটাবার জন্য উপযোগের ব্যবহারকে ভোগ বলা হয়। ভোগের ফলে অভাব দূর হলে ভোক্তা তৃপ্তি লাভ করেন। সুতরাং **ভোক্তা উপযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে যে মানসিক বা জৈবিক প্রশান্তি লাভ করেন তাকেই তৃপ্তি বলে।** তৃপ্তির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করে থাকি :

- ক) ভোগের দ্বারা অভাব মিটে যাবার একটি মানসিক অবস্থাই হল তৃপ্তি। মানুষের অভাবের কোন সীমা নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোনদিনই মানুষ অভাব পূরণ করতে পারে না। বড়জোর একজন ভোক্তা কেবল নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি অভাব মিটিয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন। যেমন— কোন এক ব্যক্তির ক্ষুধা দূর করতে যদি তাকে পর্যাপ্ত খাদ্য দিতে পারি তবে তার ক্ষুধা দূর হবে এবং তিনি আর খাদ্য গ্রহণ করতে চাইবেন না। কিন্তু এমনও বস্তু আছে যে, যতই ঐ দ্রব্য পাবেন ততই ঐ দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। যেমন— টাকা-পয়সা বা ধন-দৌলত। কারণ টাকার মাধ্যমে অনেক অভাব মেটানো যায়।
- খ) তৃপ্তি ক্ষণস্থায়ী। সাধারণত মানুষ একটি অভাব মিটিয়ে সাময়িকভাবে তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু মানসিক এ অবস্থার স্থায়িত্ব খুব কম সময়ের জন্য। এক ধরনের অভাব মিটিলে অন্য ধরনের অভাব সৃষ্টি হয়। পুরাতন অভাব নতুনভাবে দেখা দিতে পারে।
- গ) ভোগকারীর অভাব মিটিয়ে তৃপ্তি দেওয়ার সামগ্রী সীমিত, কিন্তু অভাব অসীম। তাই ভোগকারী যে অভাব মেটাবার মধ্যে অধিক তৃপ্তি আশা করেন সেটাই আগে মেটাবেন।

পরিশেষে যেহেতু তৃপ্তি একটি মানসিক অবস্থা তাই এটি পরিমাপ করা যায় না। ভোগকারী ভোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত তৃপ্তিসমূহ তুলনা করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

- মানুষের অভাব মেটানোর জন্য দ্রব্যের উপযোগ ব্যবহার করাকে ভোগ বলে।
- ভোগের ফলে অভাব দূর হলে ভোক্তা তৃপ্তি লাভ করেন। তবে তৃপ্তি যেহেতু একটি মানসিক অবস্থা তাই এটি পরিমাপ করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৩.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

- ১। ভোগ কাকে বলে?
- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ক. কোন দ্রব্য ধ্বংস করাকে | খ. উপযোগ নিঃশেষ করাকে |
| গ. উপযোগ বিনষ্ট করে ফেলাকে | ঘ. কোন দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলাকে |
- ২। তৃপ্তি কাকে বলে?
- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| ক. ব্যবহার করাকে | খ. অভাব দূর করাকে |
| গ. অভাব মেটানোর মানসিক প্রশান্তিকে | ঘ. দ্রব্যটিকে নিঃশেষ করাকে |

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। ভোগ কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন।
২। তৃপ্তি কি? এর বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা দিন।

উত্তরমালা

- অনুশীলনী ৩.১ : ১। খ ; ২। গ ; ৩। খ ; ৪। গ।
অনুশীলনী ৩.২ : ১। খ ; ২। ক।
অনুশীলনী ৩.৩ : ১। খ ; ২। গ।
অনুশীলনী ৩.৪ : ১। খ ; ২। গ।

ইউনিট ৪

চাহিদা ও যোগান

ভূমিকা

আমাদের জীবনে বিভিন্ন ধরনের চাহিদা রয়েছে। চাহিদার শেষ নেই। একটি চাহিদা মেটাতে না মেটাতেই আরো অনেক চাহিদার সৃষ্টি হয়। চাহিদার সৃষ্টি আবার যোগানের উপর নির্ভরশীল। তাই বলা হয়, যোগানই চাহিদা সৃষ্টি করে। যে সমাজে যোগান যত বেশি সেখানে চাহিদাও তত বেশি। চাহিদা, যোগান এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

পাঠ ১ : চাহিদার অর্থ, বিধি ও বিধির ব্যতিক্রম

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- চাহিদার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- চাহিদা বিধির বিবরণ দিতে পারবেন।
- চাহিদা বিধির ব্যতিক্রমসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

চাহিদা কাকে বলে?

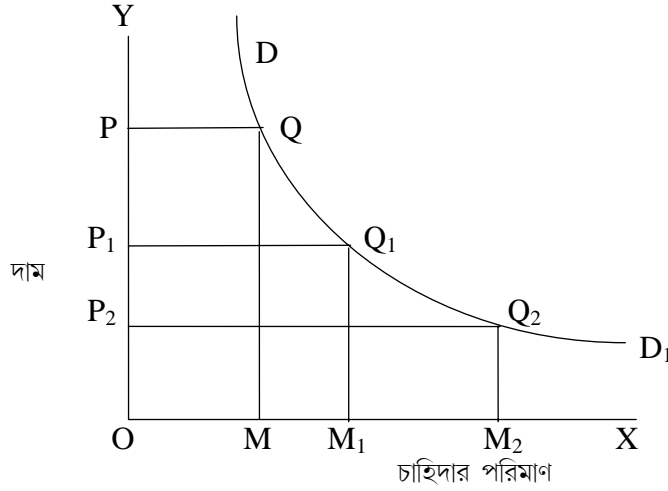
সাধারণ অর্থে কোন জিনিস পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে চাহিদা কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে নিছক আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে না। কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষাকে তখনই চাহিদা বলা হয় যখন সেই জিনিস পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে প্রয়োজনীয় ক্রয়ক্ষমতা এবং জিনিস ব্যবহার করার ইচ্ছা থাকে। ধরুন, একজন ভিক্ষুকের গাড়ি কেনার চাহিদা থাকতে পারে না; কারণ তার ক্রয়ক্ষমতা নেই। আবার ধরুন, কোন ব্যক্তির গাড়ি কেনার সামর্থ্য আছে; কিন্তু তার গাড়ি ক্রয় করার জন্য অর্থ ব্যয়ের ইচ্ছে নেই। তাই এটিকে চাহিদা বলা যাবে না। অর্থনীতিতে তাই চাহিদার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা—

- ১। কোন দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা,
- ২। দ্রব্যটি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য বা ক্রয়ক্ষমতা এবং
- ৩। অর্থ ব্যয় করে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা।

অর্থনীতিতে চাহিদার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে কোন দ্রব্যের দাম জানা না থাকলে তার চাহিদা জানা যাবে না। বস্তুত কোন বস্তুর চাহিদা বলতে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে ক্রেতার কি পরিমাণ বস্তু ক্রয় করতে ইচ্ছুক তাকে বুঝায়।

চাহিদা বিধি

চাহিদার সাথে দামের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। দ্রব্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে। বিধিটিতে বলা হয়, ক্রেতার রুচি ও পছন্দ, অভ্যাস, আর্থিক আয়, ক্রেতার সংখ্যা, অন্যান্য দ্রব্যাদির দাম ইত্যাদি বিষয়গুলো অপরিবর্তিত থাকলে কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ উচ্চ দামে কম হয় এবং স্বল্প দামে বেশি হয়। পরের পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের সাহায্যে চাহিদা বিধিটি প্রকাশ করা হল।



চিত্রে OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দামের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। OP দামে চাহিদার পরিমাণ OM। দাম হ্রাস পেয়ে OP₁ হলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে OM₁ হয়। তেমনি দাম আরও হ্রাস পেয়ে যখন OP₂ হয় তখন চাহিদাও বেড়ে OM₂ হয়। P বিন্দুর উপর অঙ্কিত লম্ব এবং M বিন্দুর উপর অঙ্কিত লম্ব Q বিন্দুতে ছেদ করে। একইভাবে Q₁ ও Q₂ বিন্দু পাওয়া যায়। Q, Q₁, Q₂ বিন্দুসমূহ যোগ করলে একটি রেখা পাওয়া যায়। এই রেখাকে চাহিদা রেখা বলা হয়।

চাহিদা বিধির ব্যতিক্রম

চাহিদা বিধিটির কতকগুলো ব্যতিক্রম রয়েছে। নিচে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

১। **উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বা জঁকজমকপূর্ণ দ্রব্য** : কতকগুলো দ্রব্য আছে যেগুলো নিছক ভোগের জন্য ক্রয় করা হয় না; যেমন— মনি-মুক্তা, হীরক, দামি পাথর, উচ্চ মূল্যের অলংকার, মূল্যবান পোশাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পেলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। এসকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা বিধিটি সাধারণত কার্যকর হয় না।

২। **শেয়ার ও দ্রব্যের ফটকা বাজারে লেনদেন** : শেয়ার বাজারে দেখা যায় শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পেলে তা আরও বৃদ্ধি পাবে এ আশায় ক্রেতারা অধিক সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করে। সুতরাং চাহিদা বৃদ্ধি পায়। একইভাবে কোন কোম্পানির শেয়ারের দাম হ্রাস পেতে থাকলে সাধারণত চাহিদা আরও হ্রাস পায়।

৩। **রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন** : মানুষের রুচি, পছন্দ, অভ্যাস প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা বিধিটি কার্যকরী হবে না। লোকের রুচির পরিবর্তনের ফলে রেডিও বা টেলিভিশনের চাহিদা বাড়ে। এসব ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পেলেও চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

৪। **পরিস্থিতি বা পরিবেশের পরিবর্তন** : পরিস্থিতি বা পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা বিধি কার্যকরী হয় না। যেমন, কলেরার প্রাদুর্ভাব হলে মাছের দাম যদি কমেও যায় তবু চাহিদা বাড়ে না।

৫। **ভোগকারীর অজ্ঞতা** : কোন কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও অজ্ঞতাবশত ক্রেতাগণ একে মূল্যবান মনে করে অধিক পরিমাণে ক্রয় করে এবং দাম কমলে ঐ দ্রব্য নিকৃষ্ট মনে করে কম ক্রয় করে। এক্ষেত্রেও চাহিদা বিধি কার্যকর হবে না।

সারসংক্ষেপ

- কোন জিনিস ক্রয় করার ক্ষমতা ও ব্যবহারের ইচ্ছা থাকলে তার আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলা হয়।
- কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। একে চাহিদা বিধি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : অনুশীলনী ৪.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

- ১। চাহিদা কাকে বলে?
 - ক. কোন জিনিস পাওয়ার জন্য ক্রেতার আকাঙ্ক্ষাকে
 - খ. ক্রেতা কর্তৃক দ্রব্য ক্রয় করবার ক্ষমতাকে
 - গ. ক্রেতা কর্তৃক দ্রব্য ক্রয়ের ইচ্ছাকে
 - ঘ. কোন জিনিস পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, ক্রয়ের সামর্থ্য এবং ইচ্ছাকে
- ২। চাহিদা বিধি কি?
 - ক. চাহিদার ধরন ও পরিমাণ পরিবর্তন
 - খ. দ্রব্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক
 - গ. স্বল্পদামে অধিক পরিমাণে চাহিদা
 - ঘ. চাহিদার গুণগত পরিবর্তন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। চাহিদার সংজ্ঞা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। চাহিদা কাকে বলে? চাহিদা বিধিটি ব্যাখ্যা করুন।
- ২। চাহিদা বিধিটি ব্যাখ্যা করুন। এর তিনটি ব্যতিক্রম বর্ণনা করুন।

পাঠ ২ : চাহিদার সূচি, চাহিদা রেখা, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- চাহিদা সূচি কি তা বলতে পারবেন।
- চাহিদা রেখা অংকন করতে পারবেন।
- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিভাবে নির্ধারণ করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

চাহিদার সূচি

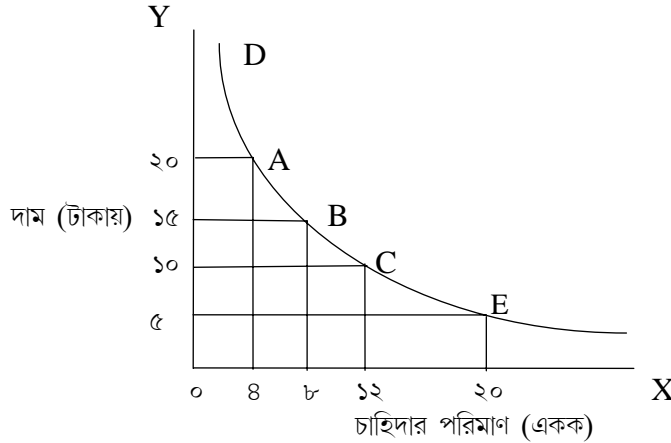
কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে ক্রেতা একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তার তালিকাকে চাহিদা সূচি বলে। দাম ও চাহিদার পরিমাণের মধ্যে যে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান সেটা চাহিদা সূচির মাধ্যমে দেখানো হয়। সাধারণত লোকে দাম কম হলে বেশি দ্রব্য ক্রয় করে এবং দাম বেশি হলে দ্রব্য কম ক্রয় করে। নিচে চাহিদা সূচির একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

সারণি

প্রতিটি আমের মূল্য (টাকায়)	মোট চাহিদার পরিমাণ (সংখ্যায়)
২০	৪
১৫	৮
১০	১২
৫	২০

ধরা যাক প্রতিটি আমের মূল্য যখন ২০.০০ টাকা তখন একজন লোক ৪টি আম ক্রয় করে। এই দ্রব্যের দাম কমে যখন ১৫.০০ টাকায় আসে তখন তার চাহিদার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৮টিতে। এ ভাবে দাম কমার সাথে সাথে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২০ টিতে।

কোন চাহিদা সূচিকে রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। চাহিদা সূচির মত চাহিদা রেখাতেও দামের সাথে চাহিদার সম্পর্ক প্রকাশ পায়। সুতরাং যে রেখার সাহায্যে চাহিদা সূচিকে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা রেখা বলে। নিচে চাহিদা রেখার একটি উদাহরণ দেওয়া হল।



উপরের রেখা চিত্রে OX এবং OY অক্ষে যথাক্রমে দ্রব্যের চাহিদা ও দাম পরিমাপ করা হয়েছে। আমের দাম যখন প্রতিটি ২০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৪টি। দাম কমে ১৫ টাকা, ১০ টাকা ও ৫ টাকা হলে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৮, ১২ ও ২০টি হয়। এখন OY অক্ষের ২০ এবং OX অক্ষের ৪ সূচক বিন্দু থেকে লম্ব আঁকলে তারা পরস্পর A বিন্দুতে মিলিত হবে। অনুরূপভাবে OX এবং OY অক্ষের যথাক্রমে ৮ ও ১৫ সূচক বিন্দু এবং ১২ ও ১০ সূচক বিন্দু এবং ২০ ও ৫ সূচক বিন্দু থেকে লম্ব অংকন করলে তারা যথাক্রমে B, C ও E বিন্দুতে পরস্পর মিলিত হবে। দাম ও চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক A,B,C,E বিন্দুসমূহ সংযুক্ত করলে যে রেখা পাওয়া যায় তা-ই চাহিদা রেখা। এভাবে কোন চাহিদা সূচিকে রেখাচিত্রে রূপান্তর ঘটিয়ে চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বা নমনীয়তা

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বা নমনীয়তা দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে চাহিদার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির সম্পর্ককে বুঝায়। চাহিদা বিধিতে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোন দ্রব্যের মূল্য কমলে ঐ দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং মূল্য বাড়লে চাহিদা কমে। কিন্তু মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে সমান হয় না। সাধারণত দামের নির্দিষ্ট পরিবর্তনের ফলে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের চাহিদা কম পরিবর্তনশীল, কিন্তু বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা অধিক পরিবর্তনশীল। তাই দেখা যায় যে চাল, গম, লবণ, তেল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তনের মাত্রা খুবই কম। পক্ষান্তরে বিলাসদ্রব্য, যেমন— টেলিভিশন, ফ্রিজ, মোটর গাড়ি ইত্যাদির ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। **দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদা যে পরিমাণে বা হারে পরিবর্তিত হয়, তাকেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বা নমনীয়তা বলা হয়।**

নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ করা হয় :

$$\text{চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের হার}}{\text{দাম পরিবর্তনের হার}}$$

যেসব দ্রব্যের চাহিদা দাম পরিবর্তনের তুলনায় কম পরিবর্তনশীল, তাদের চাহিদাকে বলা হয় অস্থিতিস্থাপক এবং যাদের চাহিদা অধিক পরিবর্তনশীল তাদের চাহিদাকে বলা হয় স্থিতিস্থাপক।

সারসংক্ষেপ

- কোন নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তার তালিকাকে চাহিদা সূচি বলে।
- দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে তার চাহিদা যে পরিমাণে বা হারে পরিবর্তিত হয় তাকেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। চাহিদা সূচি কি?
 - ক. বিভিন্ন দামে ক্রেতা যে পরিমাণ কিনতে ইচ্ছুক
 - খ. বিভিন্ন সময়ে ক্রেতা যে পরিমাণ কিনতে ইচ্ছুক
 - গ. চাহিদা বিধির ব্যতিক্রমের পরিমাণ
 - ঘ. বিভিন্ন সময়ে ক্রেতার যে পরিমাণ দ্রব্য প্রয়োজন।
- ২। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি ?
 - ক. চাহিদার মানের পরিবর্তন
 - খ. চাহিদার আপেক্ষিক পরিবর্তন
 - গ. দ্রব্যমূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক
 - ঘ. দ্রব্যের মূল্যের সাথে চাহিদার উঠানামা

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩ : সরবরাহ বা যোগানের অর্থ, বিধি ও বিধির ব্যতিক্রম

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ থেকে আপনি—

- যোগান কাকে বলে বলতে পারবেন।
- যোগান বিধি কি তা বলতে পারবেন।
- যোগান বিধিটির ব্যতিক্রম কি কি তা বলতে পারবেন।

যোগান বা সরবরাহের অর্থ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে বাজার থেকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি। সাধারণত কোন বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের যোগান বলতে ঐ দ্রব্যের যে পরিমাণ বাজারে বর্তমান থাকে তাকে বুঝায়। অর্থনীতিতে যোগান শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করতে বিক্রেতা প্রস্তুত থাকে তাকেই যোগান বা সরবরাহ বলে।

যোগান বিধি

যে বিধির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের সাথে তার যোগানের সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় তাকে যোগান বিধি বলে। অন্যান্য বিষয়, যেমন— উৎপাদন পদ্ধতি, উপকরণের প্রাপ্তি, উপকরণের মূল্য ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগান হ্রাস পায়। দাম ও যোগানের মধ্যকার এই সম্পর্ককেই যোগান বিধি বলা হয়। এই বিধি অনুযায়ী দাম কমলে বিক্রেতা কম পরিমাণ যোগান দেবে এবং দাম বাড়লে অধিক পরিমাণ যোগান দেবে। মুনাফা বৃদ্ধির জন্য বিক্রেতা এরূপ আচরণ করে।

যোগান বিধির ব্যতিক্রম

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে যোগান বিধিটির ব্যতিক্রম দেখা যায় :

১। এমন অনেক দ্রব্য আছে যার পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং দাম হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে এদের যোগান পরিবর্তিত হয় না। যেমন- প্রখ্যাত শিল্পীদের আঁকা দুর্লভ ছবি, পুরাকীর্তি ইত্যাদি।

২। দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে যদি বিক্রেতা মনে করে যে, ভবিষ্যতে আরও দাম বৃদ্ধি পাবে, তাহলে বর্তমান দাম বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দ্রব্যের যোগান বাড়াবে না। অনুরূপভাবে দাম কমে গেলে বিক্রেতা যদি মনে করে ভবিষ্যতে আরও কমে যেতে পারে তাহলে দাম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও যোগান বাড়াবে।

৩। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের মজুরি বৃদ্ধি পেলে তারা কম কাজ করে বেশি বিশ্রাম উপভোগ করতে চায়। ফলে মজুরি বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান কমে যায়। এক্ষেত্রে যোগানের নিয়মটি কার্যকর হয় না।

৪। এমন অনেক পণ্য আছে যা উৎপাদনের সময় শেষ হয়ে গেলে বেশি দামেও সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। যেমন, মৌসুমী ফল বা বিশেষ শ্রেণীর কৃষিপণ্য। এক্ষেত্রেও যোগান বিধিটি কার্যকর হয় না।

যোগান বিধিতে ধরে নেওয়া হয় যে, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকে। এগুলোর পরিবর্তন হলে যোগান বিধি কার্যকর নাও হতে পারে। যেমন, যাতায়াত ও পরিবহনের অসুবিধা সৃষ্টি হলে বেশি দামেও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

সারসংক্ষেপ

- কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দামে কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করতে বিক্রেতা প্রস্তুত থাকে তাকেই যোগান বলে।
- অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত রেখে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে যোগান বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগান হ্রাস পায়। এটিই যোগান বিধি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৩

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

১। যোগান কি?

- ক. বাজারে প্রাপ্ত আমদানীকৃত দ্রব্য
- খ. বিক্রেতা যে সব দ্রব্য পরবর্তী সময়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে মজুদ করে রাখে
- গ. একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে রাজি থাকে
- ঘ. বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি করতে চায়

২। যোগান বিধি কোনটি?

- ক. দাম ও যোগান বিপরীতমুখী
- খ. দাম কমলে যোগান কমবে
- গ. যোগান কমলে দাম বাড়বে
- ঘ. যোগান বাড়লে দাম কমবে

৩। যোগান বিধির ব্যতিক্রম কোনটি?

- ক. আরামদায়ক দ্রব্য
- খ. বিলাসজাত দ্রব্যসামগ্রী
- গ. প্রখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবি
- ঘ. অপয়োজনীয় দ্রব্য

রচনামূলক প্রশ্ন

১। যোগান কি? যোগান বিধিটি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৪ : যোগান সূচি, যোগান রেখা ও যোগানের নমনীয়তা

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- যোগান সূচি কি তা বলতে পারবেন,
- কিভাবে যোগান রেখা অঙ্কন করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- স্থিতিস্থাপক যোগান ও অস্থিতিস্থাপক যোগান কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

যোগান সূচি

কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের বিভিন্ন দামে যোগানের বিভিন্ন পরিমাণ যে তালিকায় দেখানো হয় তাকে যোগান সূচি বলা হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন দামে বিক্রয়তা একটি দ্রব্যের কি পরিমাণ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তা যোগান সূচিতে প্রকাশ পায়। নিচের সারণিতে যোগান সূচির একটি উদাহরণ দেওয়া হল:

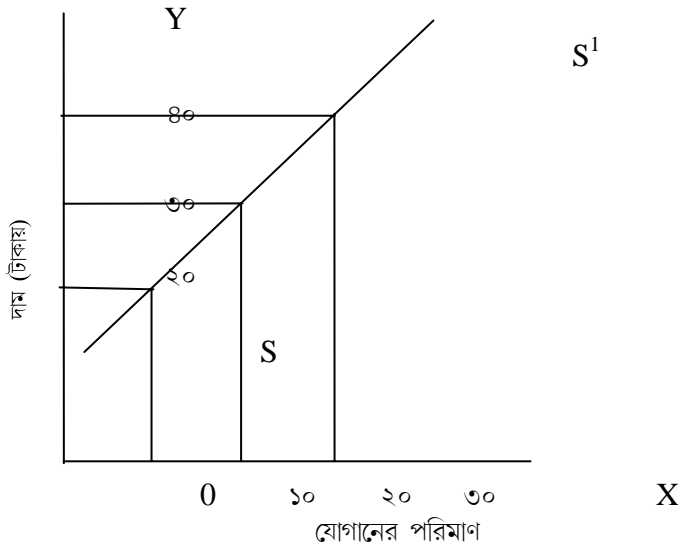
সারণি যোগান সূচি

কলমের দাম (প্রতিটি)	যোগানের পরিমাণ
২০ টাকা	১০টি
৩০ টাকা	২০টি
৪০ টাকা	৩০টি

তালিকায় দেখা যায় যে প্রতিটি কলমের দাম যখন ২০টাকা তখন বাজারে যোগানের পরিমাণ ১০টি। কলমের দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৩০টাকা ও ৪০টাকা হলে তখন বিক্রয়তার যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২০টি ও ৩০টি হয়। এভাবে দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যোগানের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। দামের পরিবর্তনের সাথে যোগানের এইরূপ পরিবর্তনের তালিকাকেই যোগান সূচি বলা হয়।

যোগান রেখা

কোন যোগান সূচিকে রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করলে যোগান রেখা পাওয়া যায়। এই রেখা বিভিন্ন দামে যোগানের সূচিরই জ্যামিতিক প্রকাশ মাত্র। এই যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়ে থাকে। উপরের সারণিতে দেখানো যোগান-সূচি অবলম্বনে একটি যোগান রেখা নিচে দেখানো হল :



চিত্রে OX অক্ষে কলমের যোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে কলমের দাম দেখানো হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, দাম বাড়লেই যোগান বাড়ে এবং দাম কমলেই যোগান কমে। কলমের দাম যখন ২০ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ

হল ১০টি। কলমের দাম বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৩০ টাকা এবং ৪০ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০টি এবং ৩০টি হয়। এভাবে দাম হ্রাস বা বৃদ্ধির সাথে সাথে যোগানের পরিমাণ একইভাবে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। চিত্রে SS' রেখাটি যোগান রেখা। বিভিন্ন দামে বিক্রেতা কি পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করবে তা যোগান রেখার দ্বারা নির্দেশ করা যায়।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

কোন দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে এর যোগানের হারে যে পরিবর্তন হয় তাকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে। দ্রব্যের দাম কমলে যোগান কমে এবং দাম বাড়লে যোগান বাড়ে। দামের সাথে যোগানের পরিবর্তনের হার সব ক্ষেত্রে সমান নয়। কোন কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে যোগানের বেশি পরিবর্তন ঘটে, আবার কতকগুলো দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সামান্য হয়। দাম পরিবর্তনের ফলে যে হারে যোগানের পরিবর্তন ঘটে সেই হারকেই যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে।

নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ করা যায় :

$$\text{যোগানের স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{যোগানের পরিবর্তনের হার}}{\text{দামের পরিবর্তনের হার}}$$

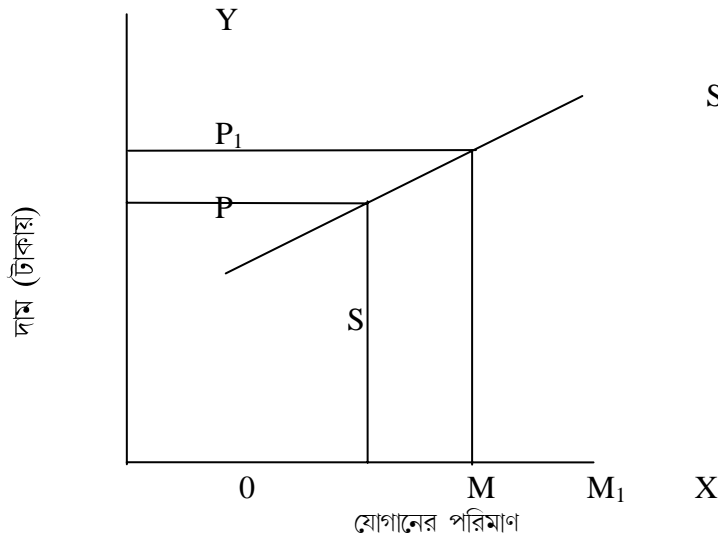
যোগানের স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা দুই ধরনের। যেমন- ক) স্থিতিস্থাপক বা নমনীয় যোগান এবং স্থিতিস্থাপক যোগান রেখা SS'

খ) অস্থিতিস্থাপক বা অনমনীয় যোগান।

স্থিতিস্থাপক বা নমনীয় যোগান

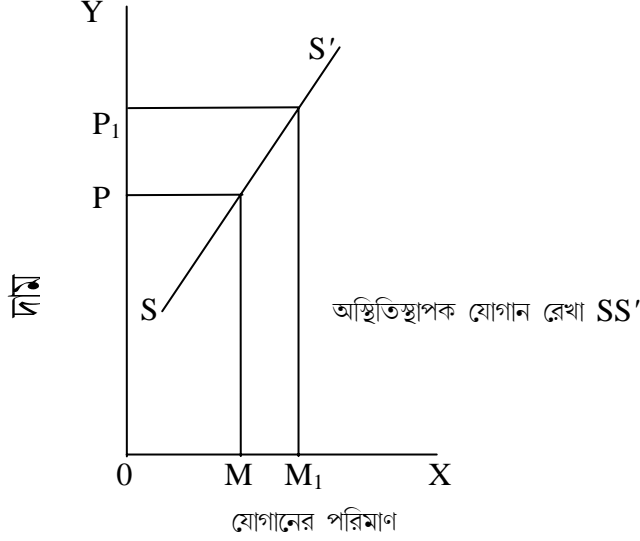
যোগানের পরিবর্তনের হার যদি দামের পরিবর্তনের হারের চেয়ে বেশি হয় তখন তাকে স্থিতিস্থাপক বা নমনীয় যোগান বলে। উদাহরণস্বরূপ, একটি দ্রব্যের দাম প্রতি একক ১০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২ টাকা হলে যোগান ১০০ একক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ একক হয়। এখানে দাম বৃদ্ধির পরিমাণ ২০% কিন্তু যোগান বৃদ্ধির পরিমাণ ৫০%। এরূপ অবস্থাকে স্থিতিস্থাপক বা নমনীয় যোগান বলে।



উপরের চিত্রে একই স্কেলের OY অক্ষে দাম এবং OX অক্ষে যোগানের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। চিত্রে দ্রব্যের দাম সামান্য বেড়ে OP থেকে OP₁ হওয়ায় যোগান অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে OM থেকে OM₁ হয়। এখানে MM₁ > PP₁ হবে। সাধারণত দীর্ঘদিন টেকসই দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হয়।

অস্থিতিস্থাপক বা অনমনীয় যোগান

দাম পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যোগান পরিবর্তনের হার কম হলে তাকে অস্থিতিস্থাপক বা অনমনীয় যোগান বলা হয়। পচনশীল দ্রব্য যেমন, শাকসবজি, ফুল বা ফল এদের যোগান অস্থিতিস্থাপক। নিচের চিত্রে অস্থিতিস্থাপক যোগান দেখানো হল :



উপরের চিত্রে OX অক্ষে যোগানের পরিমাণ ও OY অক্ষে দাম দেখানো হয়েছে। দাম OP_1 থেকে কমে OP হয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় যোগানের হ্রাস খুব কম হারে হয়েছে, OM_1 থেকে OM -এ নেমে এসেছে। অর্থাৎ মূল্য পরিবর্তনের হারের তুলনায় যোগানের পরিবর্তনের হার কম। এক্ষেত্রে $MM_1 < PP_1$ । এটাই অস্থিতিস্থাপক যোগান।

সারসংক্ষেপ

- কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন দ্রব্যের বিভিন্ন দামের সাথে যোগানের বিভিন্ন পরিমাণ যে তালিকায় দেখানো হয় তাকে যোগান সূচি বলে।
- কোন দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে যে হারে যোগানের পরিবর্তন ঘটে সেই হারকেই যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : অনুশীলনী ৪.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। যোগান সূচি কি?

ক. বিক্রেতা যে সব দ্রব্য বিক্রয় করতে ইচ্ছুক

খ. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দ্রব্যের যোগানের তালিকা

গ. বিভিন্ন দামে যোগানের বিভিন্ন পরিমাণের তালিকা

ঘ. মোট যোগানের পরিমাণ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। যোগান সূচি কি? যোগান রেখা কিভাবে আঁকতে হয়?

২। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? স্থিতিস্থাপক যোগান ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ৪.১ : ১। ঘ, ২। খ

অনুশীলনী ৪.২ : ১। ক, ২। গ

অনুশীলনী ৪.৩ : ১। গ, ২। খ, ৩। গ

অনুশীলনী ৪.৪ : ১। গ

ইউনিট ৫

উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণ

ভূমিকা

আগের পাঠ থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, মানুষের নানান ধরনের পণ্য ও সেবাকর্মের চাহিদা রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদানের ফলে এসব চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন দেশ তার প্রাপ্ত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষের অভাব পূরণের জন্য অর্থনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকে। বস্তুত চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যেই উৎপাদনকারীরা উৎপাদন করে এবং যোগান দেয়। এই ইউনিটে আমরা উৎপাদন কি এবং উৎপাদনের উপাদান নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠ ১ : উৎপাদনের সংজ্ঞা ও উপযোগের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- উৎপাদন কাকে বলে বলতে পারবেন।
- উপযোগের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উৎপাদন কাকে বলে?

একটি ইটের কথা ধরুন। এই ইটটি প্রকৃতিতে তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায় না। একে ইটের ভাটায় মাটি দিয়ে তৈরি করতে হয়েছে। মাটি থেকে ইটের এই ধরনের পরিবর্তনকে আমরা উৎপাদন বলব।

সাধারণভাবে উৎপাদন বলতে কোন কিছু সৃষ্টি করাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে উৎপাদন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন বলতে অর্থনীতিতে উপযোগ সৃষ্টি করা বুঝায়। বস্তুত মানুষ কোন পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে না, ধ্বংসও করতে পারে না। মানুষ শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত কোন বস্তু বা পদার্থের রূপান্তর বা আকারগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করতে পারে। তাই উৎপাদন মানে উপযোগ বা কাম্যতা সৃষ্টি। অন্য কথায় দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টি।

উপযোগ সৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তুলা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে কাপড়ের কল থেকে যখন রঙিন শাড়ি হয়ে বের হয় তখন তার দাম তুলার দামের চেয়ে অনেক বেশি। কাপড় উৎপাদন করে কাপড়ের কল তুলার মূল্যের তুলনায় কাপড়খানার এই অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করে বা আগের মূল্যের সাথে নতুন মূল্য যোগ করে। অনুরূপভাবে, কৃষক জমিতে চাষ করে কৃষিপণ্য উৎপন্ন করে, শিল্প শ্রমিক নানারূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে, আইনজীবী আমাদেরকে আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দিয়ে উপযোগ সৃষ্টি করে। এগুলো সবই উৎপাদনের কাজ। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, **মানুষ প্রকৃতি-প্রদত্ত বস্তুর সঙ্গে নিজের শ্রম ও পুঁজি কাজে লাগিয়ে অধিকতর উপযোগ সৃষ্টি করে। উপযোগ বা কাম্যতা সৃষ্টিকে উৎপাদন বলে।**

উৎপাদনের শ্রেণীবিভাগ

মানুষ প্রধানত প্রকৃতি-প্রদত্ত পদার্থের আকার, স্থান, সময় ও মালিকানার পরিবর্তন ঘটিয়ে উৎপাদন তথা উপযোগ সৃষ্টি করে। তাই মানুষের সৃষ্ট এই উপযোগকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— ১। রূপগত উপযোগ, ২। স্থানগত উপযোগ, ৩। সময় বা কালগত উপযোগ এবং ৪। হস্তান্তরযোগ্য উপযোগ।

১। রূপগত উপযোগ : কোন বস্তুর রূপ বা আকার পরিবর্তন করে যে উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তাকে রূপগত উপযোগ বলা হয়। যেমন— কাঠের আকৃতি পরিবর্তন করে চেয়ার ও টেবিল তৈরি করাকে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি বলা হয়।

২। স্থানগত উপযোগ : কোন বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে উপযোগ বৃদ্ধি করা যায়। একে স্থানগত উপযোগ বলে। যেমন— নদী থেকে মাছ ধরে শহরের বাজারে আনলে অধিক দামে বিক্রি হয়।

৩। সময়গত বা কালগত উপযোগ : সময় অতিক্রান্ত হবার মাধ্যমে উপযোগ সৃষ্টি হতে পারে। কোন দ্রব্য উৎপাদনের পর কিছুকাল মজুদ রাখলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এরূপ উপযোগকে সময়গত বা কালগত উপযোগ বলে। যেমন— কোন্ড স্টোরজে আলু সংরক্ষণ করে আলুর কালগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়।

৪। হস্তান্তরজনিত বা মালিকানার উপযোগ : কোন একা ব্যক্তির নিকট কোন পণ্যের উপযোগ কম, অথচ ঐ পণ্যের উপযোগ আরেক ব্যক্তির কাছে বেশি। এমতাবস্থায় পণ্যটি হস্তান্তর করলে এর উপযোগ বাড়ে। একে হস্তান্তরজনিত বা মালিকানার উপযোগ বলা হয়।

উপরে কেবলমাত্র পণ্যের উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেবাকর্ম সৃষ্টি বা বৃদ্ধিও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। মানুষ তার শ্রম ও সেবাকর্ম দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি করে বা বৃদ্ধি করে তাকে সেবাগত উপযোগ বলা হয়।

উৎপাদনের উপাদান

কোন কিছু উৎপাদনের জন্য যে সকল বস্তু বা সেবাকর্ম আবশ্যিক ঐগুলোকে উৎপাদনের উপাদান বলা হয়। এগুলো হল- **ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।** এই চারটি উপাদান ছাড়া উৎপাদন করা মোটেই সম্ভব নয়। আমরা পর্যায়ক্রমে এই চারটি উপাদান নিয়ে আলোচনা করব।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি বোঝায়। উপযোগ মানে কাম্যতা সৃষ্টি।
- উৎপাদনের ফলে দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য জন্মে।
- মানুষ চার ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন— রূপগত, স্থানগত, কালগত ও হস্তান্তরযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। উপযোগ সৃষ্টির ফলে দ্রব্যের কি বৃদ্ধি পায়?

ক. বিক্রয় মূল্য	খ. ধার্য মূল্য
গ. ব্যবহারিক মূল্য	ঘ. ক্রয় মূল্য
- ২। কাঠ দিয়ে চেয়ার তৈরি করার ফলে কি ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়?

ক. রূপগত	খ. কালগত
গ. স্থানগত	ঘ. হস্তান্তরজনিত
- ৩। নদীর মাছ বাজারে বিক্রয় করা হলে কি ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়?

ক. স্থানগত	খ. কালগত
গ. রূপগত	ঘ. হস্তান্তরজনিত
- ৪। কোন্ড স্টোরেজ আলুর সংরক্ষণে কি ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়?

ক. স্থানগত	খ. কালগত
গ. রূপগত	ঘ. হস্তান্তরজনিত

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। উৎপাদন বলতে কি বুঝায়?
- ২। উপযোগের শ্রেণীবিভাগসমূহ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। উৎপাদন কাকে বলে?
- ২। রূপগত উপযোগ কি?
- ৩। হস্তান্তরজনিত উপযোগ কি?

পাঠ ২ : ভূমি

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ভূমির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- উৎপাদনে ভূমির ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমি কি?

উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে প্রধান হল ভূমি। সাধারণ অর্থে ভূমি বলতে ভূ-ত্বক বা মৃত্তিকাকেই বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে এটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে ভূমি বলতে উৎপাদনের সহায়ক সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদকে বুঝায়। প্রকৃতির যে সকল দান উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাদের সকলকে ভূমি বলে ধরা হয়। সুতরাং ভূ-পৃষ্ঠ, আবহাওয়া, জলবায়ু, আলো-বাতাস, বৃষ্টিপাত, মাটির উর্বরা শক্তি, খনিজদ্রব্য, খাল-বিল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্ভুক্ত। কোন কিছু উৎপাদনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল ভূমির।

এই আলোচনা থেকে আমরা ভূমি সম্পর্কে ধারণা পেলাম। এবার আসুন ভূমির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি।

ভূমির বৈশিষ্ট্য

ভূমির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে এবং এ বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যই ভূমি অন্যান্য উপাদান থেকে স্বতন্ত্র। ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

ভূমি প্রকৃতির দান : ভূমি প্রকৃতির দান, মানুষ ভূমি সৃষ্টি করেনি। এর কোন উৎপাদন খরচ নেই। তবে ভূমিকে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য ব্যয় করতে হয়। যেমন, মানুষ তার চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে বন-জঙ্গল পরিষ্কার বা সমুদ্র উপকূলে বাঁধ দিয়ে যে জমি উদ্ধার করে তার জন্য খরচ করতে হয়। জমিকে চাষযোগ্য বা উর্বরা করে গড়ে তুলতে ব্যয় করতে হয়।

ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ : ভূমির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর যোগান সীমাবদ্ধ। পৃথিবীতে ভূমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। মানুষের চেষ্টায় এর হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব নয়। মানুষ চেষ্টা করে এর ঘট্টকু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারে তা মোট পরিমাণের তুলনায় অতি নগন্য।

ভূমি স্থানান্তরযোগ্য নয় : ভূমি স্থানান্তর করা যায় না অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অন্য উপাদান, যেমন— শ্রম বা মূলধন স্থানান্তর করা যায়।

সকল ভূমি সমজাতীয় নয় : ভূমির অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, সকল ভূমি সমজাতীয় বা একই গুণসম্পন্ন নয়। বিভিন্ন ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা ও অবস্থান বিভিন্ন ধরনের।

ভূমি স্থায়ী উপাদান : ভূমি অবিনশ্বর। এটি একটি স্থায়ী উপাদান। কিন্তু উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান অস্থায়ী।

ভূমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর : উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে একই পরিমাণ ভূমিতে অধিক হারে শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করলেও উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পায়। এটাই হল ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি। এ বিষয়টি ভূমির ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য।

উৎপাদনে ভূমির ভূমিকা

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা— এই পাঁচটি মানুষের মৌলিক চাহিদা। এই মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্যই মানুষ উৎপাদন কার্য পরিচালনা করে। ভূমি কিভাবে এই উৎপাদন কার্যে ভূমিকা রাখছে তা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হল :

খাদ্য : ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন। এই খাদ্য ভূমি চাষ করে ফলাতে হয়।

বস্ত্র : মানুষ লজ্জা ও শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র ব্যবহার করে। এই বস্ত্র তৈরি করার জন্য কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। যেমন— তুলার কথাই ধরুন। ভূমি ব্যবহার করে তুলা চাষ না করলে আপনি বস্ত্র তৈরি করতে পারবেন না। সুতরাং বস্ত্র উৎপাদনে ভূমির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাসস্থান : মানুষ নিরাপত্তা ও আরাম-আয়েসের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করে। এই বাসস্থান নির্মাণ করা হয় ভূমির উপর। আর নির্মাণের জন্য নানাবিধ উপকরণ, যেমন— বাঁশ, কাঠ, ইট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমি থেকেই পাওয়া যায়।

শিক্ষা : শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে গড়ে। এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। ভূমি থেকে উৎপন্ন উপকরণ ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া শিক্ষা গ্রহণের সবচেয়ে মূল্যবান উপকরণ হল কাগজ। এই কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ, গোওয়া কাঠ ও আখের আঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এগুলোর সবই ভূমি ব্যবহার করে উৎপন্ন করা হয়।

চিকিৎসা : চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, ওষুধ ও হাসপাতাল প্রয়োজন। হাসপাতাল ভূমির উপর নির্মাণ করতে হয়। এ ছাড়া ওষুধপত্রের প্রায় সব কাঁচামালই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমি থেকে আসে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান এবং কলাকৌশল অপরিবর্তিত রেখে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি উপাদান নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকলে যে হারে খরচ বৃদ্ধি পেতে থাকে ঠিক সে হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। উৎপাদন বৃদ্ধির এরূপ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

ভূমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রয়োগ : অধ্যাপক মার্শালের মতে- “বর্ধিত পরিমাণ মূলধন ও শ্রম কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ করলে উৎপাদন সাধারণত আনুপাতিক হার অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পায়।”

বাস্তব অবস্থা থেকে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিধিটি কার্যকর হয়। তবে ভূমির ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এর মূল কারণ এই যে, ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ। মানুষ ইচ্ছে করলেই ভূমির যোগান বৃদ্ধি করতে পারে না। এই অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে বর্ধিত শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং একই জমিতে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলেও খরচের তুলনায় উৎপাদন ক্রমশ কমতে থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধির এই নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি বলা হয়। নিচে একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল :

সময়কাল	ভূমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধন (টাকায়)	মোট উৎপাদন	বাড়তি বা প্রান্তিক উৎপাদন
১ম বছর	১ হেক্টর	১০০০	২০ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল
২য় বছর	১ হেক্টর	২০০০	৩১ কুইন্টাল	১১ কুইন্টাল
৩য় বছর	১ হেক্টর	৩০০০	৩৯ কুইন্টাল	৮ কুইন্টাল
৪র্থ বছর	১ হেক্টর	৪০০০	৪৬ কুইন্টাল	৭ কুইন্টাল

ধরুন, একজন কৃষক ১ হেক্টর জমিতে ১০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে ২০ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করল। দ্বিতীয় বছরে ঐ একই জমিতে ২০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে ধান পেল ৩১ কুইন্টাল, অর্থাৎ অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন হল ১১ কুইন্টাল। এখানে তার প্রান্তিক উৎপাদন বেশি। তবে তৃতীয় বছরে ৩০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে মোট উৎপাদনের পরিমাণ হল ৩৯ কুইন্টাল এবং বাড়তি উৎপাদন হল ৮ কুইন্টাল। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদনের পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের অনুপাতে কম হয়েছে। চতুর্থ বছরে ঐ একই জমিতে ৪০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগে মোট উৎপাদন হয় ৪৬ কুইন্টাল অর্থাৎ বাড়তি উৎপাদনের পরিমাণ আরো কম, ৭ কুইন্টাল। এভাবে দেখা যায় যে, একই জমিতে অধিক হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু প্রান্তিক (বাড়তি) উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায়।

বিধিটির ব্যতিক্রম

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কতকগুলো শর্তসাপেক্ষে কার্যকর হয় না। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে : উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রমক্রাসমান উৎপাদন বিধিটি সাধারণত কার্যকর হয় না। কারণ প্রথমদিকে শ্রম ও মূলধনের মাত্রা যদি জমিটির জন্য উত্তমরূপে চাষের ক্ষেত্রে যথেষ্ট না হয় তাহলে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

উন্নত বীজ ও সার প্রয়োগ : কৃষিক্ষেত্রে অধিক ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার প্রয়োগ বা সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে জমির উন্নতি সাধন করলেও এ বিধিটি কার্যকর হয় না।

আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করলে : উৎপাদন পদ্ধতি একই রকম থাকলে বিধিটি কার্যকর হয়। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে চাষ পদ্ধতি উন্নত করলে এ বিধিটি কার্যকর হবে না।

প্রাকৃতিক কারণ : প্রাকৃতিক কারণে যদি হঠাৎ জমির উর্বরতা হ্রাস পায় তাহলে ক্রমক্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয় না।

উপরে বর্ণিত কারণে সাময়িকভাবে এ বিধিটি কার্যকর না হলেও এমন সময় আসবে যখন বিধিটি কার্যকর হবে। এজন্য এটিকে চূড়ান্ত বিধি বলা যায়।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনীতিতে ভূমি বলতে উৎপাদনের সহায়ক সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে বুঝায়।
- ভূমি প্রকৃতির দান, এর যোগান সীমাবদ্ধ।
- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা— এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদার জন্য যে উৎপাদন প্রয়োজন তাতে ভূমির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।
- বর্ধিত পরিমাণ মূলধন ও শ্রম কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ করলে উৎপাদন সাধারণত আনুপাতিক হার অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। উৎপাদনের সহায়ক সবধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে কি বলে?

ক. ভূমি	খ. শ্রম	গ. মূলধন	ঘ. সংগঠন
---------	---------	----------	----------
- ২। কোনটি প্রকৃতির দান?

ক. ভূমি	খ. শ্রম	গ. মূলধন	ঘ. সংগঠন
---------	---------	----------	----------
- ৩। ভূমি বলতে কি বুঝায়?

ক. পৃথিবীর স্থলভাগ	খ. প্রকৃতির দান সকল সম্পদ
গ. ভূপৃষ্ঠের জলভাগ	ঘ. কেবল উৎপাদনে ব্যবহৃত জমি
- ৪। ক্রমক্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কখন ব্যাহত হয়?

ক. উৎপাদন পদ্ধতি একই রকম থাকলে	খ. প্রাকৃতিক কারণে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেলে
গ. প্রযুক্তিবিদ্যা একই রকম থাকলে	ঘ. পানিসেচ ও সার ব্যবহারে পরিবর্তন না হলে।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
- ২। ক্রমক্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কাকে বলে? একটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। ভূমি কি?
- ২। উৎপাদনে ভূমির ভূমিকা কি?

পাঠ ৩ : শ্রম

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- শ্রমের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রমের যোগান কিসের উপর নির্ভর করে তা বলতে পারবেন।

শ্রম কি?

সাধারণ অর্থে শ্রম বলতে মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে শ্রম শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। **উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক কাজ ও সেবাকর্ম এবং যার বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায় তাকেই অর্থনীতিতে শ্রম বলা হয়।** একজন কৃষক বা জেলে বা রিকস্যাচালকের শারীরিক প্রচেষ্টা যেমন শ্রম, তেমনি শিক্ষকের শিক্ষকতা, ডাক্তারের পরামর্শ বা উকিলের বুদ্ধিজাত প্রচেষ্টাও শ্রমরূপে গণ্য হয়। কিন্তু অর্থ উপার্জন ছাড়া কেবল আনন্দ লাভ বা স্নেহের টানে যে পরিশ্রম করা হয় তা শ্রম নয়। তাই সন্তান প্রতিপালনের জন্য মাতা-পিতার পরিশ্রম ও কষ্টকে অর্থনীতিতে শ্রম বলা হয় না।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য

শ্রম উৎপাদনের একটি আদি ও মৌলিক উপাদান। উৎপাদনের উপাদান হিসেবে শ্রমের কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে এগুলো আলোচনা করা হল :

১। **শ্রম একটি জীবন্ত উপাদান :** শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি একটি জীবন্ত উপাদান। পুঁজি ও ভূমির মত একটি প্রাণহীন জড়পদার্থ নয়। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অপরকে শ্রম দিলেও তার অনুভূতি বা সত্তা থাকে।

২। **শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ্য :** ভূমি ও মূলধনকে তাদের মালিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। কিন্তু শ্রমিক থেকে শ্রমকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

৩। **শ্রম একটি গতিশীল উপাদান :** উপাদান হিসেবে ভূমির ভৌগোলিক গতিশীলতা নেই; পুঁজির গতিশীলতাও সীমাবদ্ধ। কিন্তু সে তুলনায় শ্রমের গতিশীলতা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি।

৪। **শ্রম একটি ধ্বংসশীল উপাদান :** শ্রমশক্তি জমিয়ে রাখা যায় না। এটি একটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী উপাদান। যদি কোন শ্রমিক একদিন বা এক ঘন্টা কাজ না করে তাহলে এই সময়ের জন্য সে যে শ্রমের যোগান দিতে পারত তা চিরতরে নষ্ট হয়ে গেলে।

৫। **উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য :** উৎপাদনের সময় শ্রমিককে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে শ্রমের যোগান দিতে হয়।

৬। **শ্রমের যোগানের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ :** চাহিদা অনুযায়ী শ্রমের যোগান দ্রুত পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। কারণ, শ্রমের যোগান একটি দেশের জন্মহার, শিক্ষা, দক্ষতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ফলে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমের যোগান দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

৭। **শ্রমিকের দর কষাকষির ক্ষমতা কম :** শ্রমের ক্ষণস্থায়ী চরিত্রের জন্য শ্রমিক নিয়োগকর্তার সাথে তার পারিশ্রমিক নিয়ে খুব বেশি দর কষাকষি করতে পারে না। কর্মহীন দিন যাপনের পরিবর্তে নিম্ন পারিশ্রমিকেও সে কাজ করতে বাধ্য হয়। অবশ্য বর্তমানে শ্রমিকগণ ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে মালিকপক্ষের সাথে দর কষাকষি করতে পারে।

শ্রমের যোগান

শ্রমের যোগান বলতে যে পরিমাণ শ্রম দেশের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকেই বুঝায়। একটি দেশের শ্রমের যোগান প্রধানত দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা— (১) মোট জনসংখ্যা ও (২) শ্রমের দক্ষতা।

১। **দেশের মোট জনসংখ্যা :** কোন দেশের জনসংখ্যাই হল শ্রমশক্তির প্রধান উৎস। যে দেশে জনসংখ্যা যত বেশি সে দেশে শ্রমের যোগানও তত বেশি। শ্রমের যোগান বলতে কেবল কর্মক্ষম জনসংখ্যাকেই বুঝায়। এই কর্মক্ষম জনসংখ্যা যে দেশে যত বেশি সে দেশে শ্রমের যোগানও তত বেশি।

২। **শ্রমের দক্ষতা :** শ্রমের যোগান শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার উপরও নির্ভর করে। যে দেশে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা যত বেশি, সে দেশে শ্রমের যোগানও তত বেশি। আধুনিক জটিল উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিকের

প্রয়োজন হয়। শ্রমিক দক্ষ না হলে শ্রমিকের সংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও শ্রমের যোগান কম হয়। অপরপক্ষে শ্রমিক যদি দক্ষ হয়, তা হলে শ্রমিকের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও শ্রমের যোগান বেশি হয়।

সারসংক্ষেপ

- উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক এবং মানসিক কাজ ও সেবাকর্ম যার বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায় তাকে অর্থনীতিতে শ্রম বলা হয়।
- যে পরিমাণ শ্রম দেশের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকেই শ্রমের যোগান বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। কোনটি উৎপাদনশীল শ্রম?

ক. খেলাধুলা	খ. শস্য উৎপাদন
গ. ভ্রমণ	ঘ. ঘুড়ি উড়ানো
- ২। কোনটি শ্রমের বৈশিষ্ট্য?

ক. ধ্বংসশীল উপাদান	খ. দ্রুত বৃদ্ধি সম্ভব
গ. হস্তান্তরযোগ্য	ঘ. স্থায়ী উপাদান

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। শ্রম বলতে কি বুঝেন?
- ২। শ্রমের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করুন?

রচনামূলক প্রশ্ন :

- ১। শ্রম কি? শ্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।
- ২। শ্রমের যোগান বলতে কি বুঝায়- ব্যাখ্যা করুন?

পাঠ ৪ : ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব কি বলতে পারবেন।
- ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা করতে পারবেন।
- শ্রমের দক্ষতা কি এবং শ্রমের দক্ষতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- শ্রমবিভাগ কি তা বলতে পারবেন।
- শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

জনসংখ্যা তত্ত্ব

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোন দেশের শ্রমের যোগান প্রধানত সেই দেশের মোট জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, এর কারণসমূহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহারজনিত উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে যে তত্ত্বে আলোচনা করা হয় তাকে জনসংখ্যা তত্ত্ব বলা হয়।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

জনসংখ্যার সর্বাধিক পরিচিত তত্ত্ব হল ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাস জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বটি তাঁর নামানুসারে ম্যালথাসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত। ম্যালথাস বলেন প্রকৃতিগতভাবে মানুষের খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক প্রগতিতে বাড়ে (যেমন—১, ২, ৩, ৪, ৫ ধারায়) কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক প্রগতিতে (যেমন—১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ধারায়) অর্থাৎ জনসংখ্যা খাদ্য উৎপাদন অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পায়। ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। ম্যালথাসের মতে প্রকৃতিগতভাবে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রতি ২৫ বছরে একটি দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। এভাবে জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। দেশে খাদ্য ঘাটতি বা খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিকেই জনসংখ্যাধিকার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ম্যালথাসের মতে, যতদিন দেশে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় ততদিন পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। খাদ্যের উৎপাদন বা যোগান কম হলেই দেশে খাদ্যাভাব, অনাহার, দুঃখ-দুর্দশা, মড়ক ইত্যাদি দেখা দিবে। এর ফলে জনসংখ্যা হ্রাস পাবে। প্রকৃতি স্বয়ং এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগানের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করে। জনসংখ্যার এরূপ নিয়ন্ত্রণকে ম্যালথাস ‘প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ’ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এই তত্ত্বের বিপক্ষে প্রধান প্রধান সমালোচনাগুলো নিম্নরূপ :

১। ম্যালথাসের সমসাময়িক অবস্থায় তাঁর তত্ত্বটি কিছুটা সত্য হলেও, পরবর্তী সময়ে পশ্চিম ইউরোপের উন্নয়নের ইতিহাস ম্যালথাসের নৈরাশ্যজনক ভবিষ্যৎ বাণী মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। জনসংখ্যা সদা সর্বদা দ্রুতগতিতে বাড়ে, একথা সত্য নয়। কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, জীবন ধারণের মান বৃদ্ধির ফলে এক সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে। আধুনিক ইউরোপের অনেক দেশে বর্তমানে লোকসংখ্যা হ্রাসের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

২। খাদ্যের উৎপাদন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাড়ে, একথাও সত্য নয়। কারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে অনেক দেশেরই ফলনের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং আরও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে যা ম্যালথাস চিন্তাও করতে পারেননি।

৩। ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে খাদ্য উৎপাদনের সাথে তুলনা করেছেন এটাও সঠিক নয়। বাস্তবে যে কোন দেশের মোট সম্পদের সাথে তুলনা করা উচিত। একটি দেশে খাদ্যশস্য কম উৎপন্ন হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে সে প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য আমদানি করতে পারে। এভাবে খাদ্য ঘাটতির মোকাবিলা করতে পারে।

৪। ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির কেবলমাত্র ভয়াবহ দিকটিই বিবেচনায় এনেছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভাল দিকটি সম্পর্কে ভাবেননি। নবজাতকের ক্ষুধা অবশ্যই মেটাতে হবে, কিন্তু সে দু'খানা হাত নিয়ে জন্ম নেয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমের যোগানও বাড়ে।

৫। ম্যালথাস তার তত্ত্বে গাণিতিক হারে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন সঠিক প্রমাণ দান করেননি।

৬। জনসংখ্যার সমস্যাটি শুধু উৎপাদনের সমস্যা নয়, উৎপন্ন সম্পদের ন্যায্য ও যথোপযুক্ত বন্টনের সমস্যাও বটে। এসব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবস্থা নিলে জনসংখ্যাধিক্য জনিত সমস্যা এড়ানো যায়।

ম্যালথাসের মতবাদের নানারূপ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আংশিকভাবে এর সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত অনুন্নত ও জনবহুল দেশে ম্যালথাসের সতর্কবাণী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের উচিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সারসংক্ষেপ

- ম্যালথাস তার তত্ত্বে বলেন যে প্রকৃতিগতভাবে মানুষের খাদ্য উৎপাদন গাণিতিক হারে বাড়ে, কিন্তু জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। কোনটিকে জ্যামিতিক প্রগতি (ধারা) বলে?
 ক. ১, ২, ৩, ৪ খ. ১, ২, ৪, ৮
 গ. ১, ৩, ৬, ৯ ঘ. ১, ৪, ৯, ১৬

- ২। কোনটি গাণিতিক প্রগতিতে বৃদ্ধি পায়?
 ক. খাদ্য খ. শিল্প
 গ. জনসংখ্যা ঘ. কৃষি

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব আলোচনা করুন।
 ২। ম্যালথাসের তত্ত্বের সমালোচনাগুলো লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। জনসংখ্যা তত্ত্ব কি?

পাঠ ৫ : শ্রমের দক্ষতা

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- শ্রমের দক্ষতা বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- শ্রমবিভাগ কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শ্রমের দক্ষতা বলতে কাজের উৎকর্ষ বা গুণাগুণ ক্ষুণ্ণ না করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করার ক্ষমতাকে বুঝায়। শ্রমের দক্ষতা বাড়লে শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে। অর্থাৎ শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে, নির্দিষ্ট শ্রমিক পূর্বের তুলনায় অধিক উৎপাদন করতে সক্ষম হয়।

শ্রমের দক্ষতা সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে :

১। কাজ করার ক্ষমতা, ২। কাজ করার ইচ্ছা, ৩। সংগঠনের নৈপুণ্য ও ৪। কারখানার অবস্থা।

১। **কাজ করার ক্ষমতা** : শ্রমিকের দক্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করে তার কাজ করার ক্ষমতার উপর। এই ক্ষমতা আবার নির্ভর করে (ক) শারীরিক যোগ্যতা, (খ) শিক্ষা ও কারিগরি যোগ্যতা, (গ) বুদ্ধিগত দক্ষতা ও (ঘ) নৈতিক যোগ্যতার উপর।

২। **কাজ করার ইচ্ছা** : কাজ করার ইচ্ছার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। কাজ করার ক্ষমতার সাথে সাথে ইচ্ছাও থাকতে হবে। স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা, আগ্রহ ও উদ্দীপনা শ্রমিকের কর্মদক্ষতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করে। কাজ করার ইচ্ছা আবার অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন— কাজের সময়, নিয়মিত মজুরি প্রদান, উচ্চ বেতনহার, উন্নতির সম্ভাবনা, অবসর ভাতা, নিয়মিত লভ্যাংশ প্রদান, সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান ইত্যাদি।

৩। **সংগঠনের নৈপুণ্য** : সংগঠনের নৈপুণ্যের উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। সুদক্ষ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। মালিকের সংগঠন ক্ষমতা উচ্চমানের হলে বা উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিচালকের অধীনে কাজ করলে শ্রমিকগণ সহজেই দক্ষ হয়ে ওঠেন।

৪। **কারখানার পরিবেশ** : কারখানার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, শ্রমিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয়ও শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

৫। **আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন প্রণালী** : উন্নতমানের আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন প্রণালীর নতুনত্ব শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে।

এসব ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

শ্রমবিভাগ

আধুনিক বিশ্বে উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শ্রমবিভাগ। উৎপাদন পদ্ধতিকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে দেওয়াকে শ্রমবিভাগ বলে। প্রাচীন সমাজে প্রতিটি লোক তার নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেই উৎপাদন বা যোগাড় করত। কিন্তু আধুনিক কালে সূক্ষ্ম ও জটিল উৎপাদন ব্যবস্থায় একজনকে একটি বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। যেমন— কেউ চাষী, কেউ তাঁতী, কেউ জেলে, কেউ কামার ইত্যাদি। শিল্প বিপ্লবের পর আধুনিককালে শ্রমবিভাগ আরো ব্যাপকতর হয়েছে। বর্তমানে কোন দ্রব্যের সম্পূর্ণ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে শ্রমিকদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। এটাকেই শ্রমবিভাগ বা শ্রমবিভাজন বলা হয়।

বৃহদায়তন শিল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল শ্রমবিভাগ। উৎপাদনের প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রমিক বিভিন্ন কাজ করে এবং দক্ষতা অর্জন করে। এভাবে একে অপরের সহযোগিতায় কাজ সম্পন্ন করে। একটি তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমবিভাগের ফলে কেউ কাপড় কাটে, কেউ শার্টের কলার তৈরি করে, কেউ হাতা তৈরি করে, কেউ বোতাম

লাগায়, কেউ সংযোগ করে, কেউ ইঞ্জিন করে, কেউ প্যাকেট করে— এভাবে অনেকগুলো অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় শার্ট তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়। ফলে, প্রত্যেকটি অংশের কাজে বিভিন্ন দলের লোক দক্ষতা অর্জন করে।

শ্রমবিভাগের সুবিধাসমূহ

- ১। এই ব্যবস্থায় মানুষ তার পছন্দমত কাজ বেছে নেবার সুযোগ পায়। কাজটি তার কাছে আকর্ষণীয় হয়। এ ধরনের কাজ সম্পন্ন করে তিনি আনন্দ পান; কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।
- ২। মোট কাজের একটি বিশেষ অংশ বা একই ধরনের ক্ষুদ্র কাজে আত্মনিয়োগের ফলে শ্রমিকের পক্ষে সেই কাজে পারদর্শিতা বা দক্ষতা অর্জন করা সহজতর হয় এবং ভবিষ্যতে আরো দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হতে পারেন।
- ৩। শ্রমবিভাগের অন্য একটি সুবিধা হল এই যে, এ ব্যবস্থায় শিক্ষানবিশ হিসেবে কম সময় লাগে।
- ৪। প্রত্যেকে তার দক্ষতা অনুযায়ী কাজ পায়। সকল ধরনের কাজের একইরূপ যোগ্যতা লাগে না বা সকল মানুষের যোগ্যতা সমান নয়। তাই যাকে দিয়ে যেমন কাজ করা সম্ভব তাকে সে কাজে নিয়োগ করা যায়। বিভিন্ন ধরনের কাজে অনেককে লাগানো সম্ভব হয়। অর্থাৎ উপাদান হিসেবে শ্রমিকদের ব্যবহার সর্বাধিক পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়।
- ৫। এই ব্যবস্থায় নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের পথ সুগম হয়।
- ৬। শ্রমবিভাগের ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিকগণ সহজেই এক শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে। এভাবে শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- ৭। দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও মূল্য কমে।

শ্রমবিভাগের অসুবিধাসমূহ

- ১। শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিককে একটি মাত্র কাজ সর্বদাই করতে হয় বা একই যন্ত্র পরিচালনা করতে হয়। তাই কাজটি একঘেয়ে বা বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ে, কাজে বিরক্তি আসে।
- ২। একটি কাজের সবটুকু সম্পন্ন করার মাঝে যে পরিতৃপ্তি বা আনন্দ পাওয়া যায়, শ্রমবিভাগের ফলে তা পাওয়া যায় না।
- ৩। শ্রমবিভাগের ফলে একটি নির্দিষ্ট কাজে দক্ষতা বাড়ে। কিন্তু অন্যান্য কাজের শিক্ষা থেকে শ্রমিক বঞ্চিত হয়। অন্যান্য অনেক কাজের জন্য সে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।
- ৪। কোন কারণে যদি নির্দিষ্ট কাজ থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে বেকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।
- ৫। শ্রমিক কোন একটি ক্ষুদ্র অংশের কাজ সম্পন্ন করে এবং অন্যান্য অংশের কোন খবর রাখে না। তাই তার মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হয় না।
- ৬। কাজের অনেক অংশ যন্ত্রের সাহায্যে করা হয় বলে শ্রমিক সৃষ্টির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।
- ৭। শ্রমবিভাগ সমাজকে শ্রমিক ও মালিক এই দুইশ্রেণীতে ভাগ করে এবং তাদের মধ্যে সংগ্রামকে জিইয়ে রাখে।

সারসংক্ষেপ

- শ্রমের দক্ষতা বলতে স্বল্পতম সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষমতাকে বুঝায়।
- শ্রমের দক্ষতা নির্ভর করে (ক) কাজ করার ক্ষমতা, (খ) কাজ করার ইচ্ছা, (গ) সংগঠনের নৈপুণ্য ও (ঘ) কারখানার অবস্থার উপর।
- উৎপাদন পদ্ধতিকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করাকে শ্রমবিভাগ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

১। শ্রমের দক্ষতা বলতে কি বুঝায়?

- ক. শ্রমিকের যোগান
- খ. শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা
- গ. শ্রমিকের শারীরিক শক্তি
- ঘ. শ্রমিকের কাজের চাহিদা

২। শ্রম বিভাগ কোনটি?

- ক. যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম বন্টন
- খ. সময়ের ভিত্তিতে কর্ম বন্টন
- গ. যোগান অনুযায়ী কর্ম বন্টন
- ঘ. চাহিদা অনুযায়ী কর্ম বন্টন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শ্রমের দক্ষতা কি? শ্রমের দক্ষতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা আলোচনা করুন।

২। শ্রমবিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। শ্রমের দক্ষতা কি?

২। শ্রমের দক্ষতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

পাঠ ৬ : পুঁজি বা মূলধন

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- পুঁজি কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- পুঁজি গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- পুঁজি কিভাবে গঠিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পুঁজি কি?

সাধারণ অর্থে পুঁজি বলতে ব্যবসায় নিয়োজিত টাকা-পয়সাকে বুঝায়। অর্থনীতিতে পুঁজি শব্দটি একটি বিশেষ অর্থ জ্ঞাপন করে। মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যয়িত না হয়ে পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে পুঁজি বলে। এটা মানব সৃষ্টি, প্রকৃতি প্রদত্ত নয়। যেমন— রেললাইন, রাস্তাঘাট, যন্ত্রপাতি, কারখানা, কাঁচামাল, কৃষকের লাঙ্গল, মন্ত্রীর হাতুড়ি ইত্যাদি পুঁজি। আধুনিককালে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পুঁজির বৈশিষ্ট্য

পুঁজির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

- (ক) অতীত শ্রমের ফল : পুঁজি মানুষের অতীত শ্রমের ফল। জমির মতো এটি প্রাকৃতিক উপাদান নয়।
- (খ) পুঁজি উৎপাদনশীল : পুঁজি উৎপাদনশীল, এটি নতুন উৎপাদন করতে সাহায্য করে।
- (গ) ভবিষ্যতে আয়ের উৎস : পুঁজির মালিক পুঁজি বিনিয়োগ করে এ থেকে ভবিষ্যতে আয় অর্জন করতে পারে।
- (ঘ) সঞ্চয়ের ফল : পুঁজি বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। এটি সরাসরি ভোগে না লেগে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়।

পুঁজি গঠন

পুঁজি গঠন বলতে পুঁজি বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বোঝায়। যে প্রক্রিয়ায় পুঁজির পরিমাণ বাড়ে তাই হল পুঁজি গঠন প্রক্রিয়া। একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা কালে কোন দেশ তার বর্তমান পুঁজি যে পরিমাণ বাড়াতে পারে তা-ই ঐ সময় তার পুঁজি গঠন বা বিনিয়োগের পরিমাণ।

পুঁজি গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

সঞ্চয় থেকে পুঁজির সৃষ্টি হয়। মানুষ তার আয়ের সম্পূর্ণ অংশ ভোগ না করে কিছুটা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। এই সঞ্চয়িত অর্থ যখন উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তা পুঁজিতে পরিণত হয়। পুঁজি সৃষ্টি প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা— ১। সঞ্চয়ের সামর্থ্য, ২। সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং ৩। বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা

১। সঞ্চয়ের সামর্থ্য : মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ্য তার আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। আয় যত বেশি হবে সঞ্চয়ের সামর্থ্য তত বেশি হবে। মানুষের আয় যদি এমন হয় যে তাঁদের জীবনের ব্যয় নির্বাহের পরও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে সঞ্চয় সম্ভব হয়। অতিরিক্ত আয় থেকে এবং সঞ্চয় থেকে পুঁজির উৎপত্তি। সুতরাং সঞ্চয়ের সামর্থ্যের উপরই পুঁজির পরিমাণ নির্ভর করে। বাংলাদেশের মত গরিব দেশের লোকের মাথাপিছু আয় কম বলে তাদের সঞ্চয়ের সামর্থ্যও কম। যে কোন দেশের আয়ের পরিমাণ, মূল্যস্ফুর, পরিবারের আয়তন, রুচি, অভ্যাস, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সঞ্চয়ের সামর্থ্য নির্ধারণ করে।

২। সঞ্চয়ের ইচ্ছা : সঞ্চয়ের পরিমাণ শুধুমাত্র সঞ্চয়ের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে না। সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপরও নির্ভর করে। এমন অনেক লোক আছেন যাদের প্রচুর আয় থাকা সত্ত্বেও কোন সঞ্চয় নেই, কেননা সঞ্চয়ের প্রতি তারা গুরুত্ব দেন না। অথচ নিম্ন আয়ের লোক, যেমন গ্রামীণ ব্যাংক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের ইচ্ছা থাকার কারণে বা বাধ্যবাধকতা থাকায় সঞ্চয় করতে সক্ষম হন। দূরদৃষ্টি, উচ্চাশা ও মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা, পারিবারিক স্নেহ-মমতা, জানমালের নিরাপত্তা, সুদের হার, কর ব্যবস্থা, কৃষ্ণতা অবলম্বন প্রভৃতি বিষয়গুলোর উপর সঞ্চয়ের ইচ্ছা নির্ভর করে।

৩। বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা : পুঁজি গঠনের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা। সঞ্চয়িত অর্থ নিরাপদে বিনিয়োগের জন্য দেশে যথেষ্ট সংখ্যক ব্যাংকের শাখা, বীমা কোম্পানি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে জনসাধারণ সে সব ক্ষেত্রে অর্থ খাটানোর সুযোগ পায়। ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের সুযোগ-সুবিধার অভাব থাকলে স্বাভাবিকভাবে সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে বা আশানুরূপ পর্যায়ে গড়ে উঠবে না। পরিশেষে শিক্ষা, সচেতনতা ও দূরদৃষ্টি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকে সঞ্চয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে।

কোন দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় যথেষ্ট না হলে আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদেশী সরকার বা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ঋণ বা বিনিয়োগযোগ্য অর্থ মূলধন গঠনে সাহায্য করে।

সারসংক্ষেপ

- মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রীর যে অংশ সরাসরি ভোগে নিয়োজিত না হয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে পুঁজি বলে।
- পুঁজি গঠন প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে : (ক) সঞ্চয়ের সামর্থ্য, (খ) সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও (গ) বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। পুঁজি বলতে কি বুঝায়?
ক. উৎপাদিত পণ্যের যে অংশ আরও পণ্য উৎপাদনে সাহায্য করে
খ. ব্যাংক থেকে ব্যবসায়ের জন্য ধার করা টাকা
গ. নিজের তহবিল থেকে যে অর্থ ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হয়
ঘ. নগদ টাকা পয়সা যা ব্যাংকে গচ্ছিত আছে
- ২। পুঁজি বৃদ্ধি নির্ভর করে কিসের উপর?
ক. আয় খ. ব্যয়
গ. সঞ্চয় ঘ. মুনাফা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। পুঁজি কাকে বলে?
- ২। পুঁজির বৈশিষ্ট্য কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। পুঁজি কি? পুঁজি গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা আলোচনা করুন।

পাঠ ৭ : সংগঠন

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সংগঠন কি তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠকের ভূমিকা কি তা বলতে পারবেন।

সংগঠন কি?

উৎপাদনের চতুর্থ ও সর্বশেষ উপাদান হল সংগঠন। ভূমি, শ্রম, পুঁজি প্রভৃতি উপাদানগুলো একত্রিকরণ ও সমন্বয় সাধন করাকে সংগঠন বলা হয়। শুধুমাত্র ভূমি, শ্রম ও পুঁজি কোন কিছু উৎপাদন করতে পারে না। তাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটানোর জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এদের মধ্যে সমন্বয় ও সংযোগ সাধন, ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি বহন এবং কার্যকরি তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাই হল সংগঠন। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শিল্প উৎপাদনে বিনিয়োগ, পুঁজি সংগ্রহ, সুদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ, তত্ত্বাবধান, যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও সংগ্রহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। উৎপাদনের এসব উপাদানগুলোকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজ যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান করেন তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলা হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠকের ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বে বৃহদায়তন ও জটিল উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠক বা উদ্যোক্তাকে বহুবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। নিচে সংগঠকের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল :

১। **উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ :** সংগঠক বা উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হল কারবারের পরিকল্পনা গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণ করা। কোন দ্রব্য বা সেবাকর্ম উৎপাদন করা হবে, কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে, কিভাবে উৎপাদন করা হবে, কোথায় উৎপাদন করা হবে, কত দামে কি পরিমাণ বিক্রি করা হবে ইত্যাদি বিষয়গুলো সংগঠক স্থির করেন। কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং কি ধরনের শ্রমিক নিয়োগ করা হবে সে সম্পর্কেও সংগঠককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

২। **উপাদান সংগ্রহ ও সমন্বয় করা :** সংগঠকের অপর একটি প্রধান দায়িত্ব হল উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করা এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। উৎপাদন শুরু করার জন্য জমি সংগ্রহ, কারখানার জন্য গৃহনির্মাণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি কাজ সংগঠককেই করতে হয়। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষে সংগঠককে প্রয়াস চালাতে হয় কি করে সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে চাহিদা মাফিক অথচ সর্বাধিক উৎপাদন করা এবং সবেশি মূল্যে তা বিক্রয় করা যায়।

৩। **উৎপাদন কাজ তত্ত্বাবধান করা :** সংগঠকের অন্যতম কাজ হল উৎপাদন কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা। তিনি শ্রম, পুঁজি, কাঁচামাল, জ্বালানি প্রভৃতি সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করেন। কর্মচারীগণ তাদের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করছে কিনা সেদিকে নজর রাখেন। অবশ্য বৃহদায়তন শিল্পে বেতনভুক কর্মচারীকে পরিচালনার বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

৪। **ঝুঁকি গ্রহণ করা :** সংগঠকের সর্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ কাজ হল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করা। ব্যবসায়ের সকল প্রকার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা তিনি নিজেই বহন করেন। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাত করার অনেক আগেই সংগঠককে ভবিষ্যৎ চাহিদার পূর্বাভাসের ভিত্তিতে উৎপাদন কাজ শুরু করতে হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে মানুষের অভ্যাস, রুচি, প্রযুক্তি ইত্যাদি পরিবর্তনের ফলে চাহিদা হ্রাস পেতে পারে। অনুমানের ভিত্তিতে উৎপাদন করে ভবিষ্যতে তার যেমন লাভ হতে পারে, তেমনি ক্ষতিও হতে পারে। সংগঠক বা উদ্যোক্তা সেই ঝুঁকি গ্রহণ করেই উৎপাদনের কাজ চালান।

৫। **বন্টনের কাজ :** সংগঠককে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের উৎপাদিত আয় তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী বন্টন করতে হয়। জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামালের দাম, মূলধনের সুদ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের প্রাপ্য অংশ তাকে পরিশোধ করতে হয়। এসব পরিশোধের পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাই সংগঠকের প্রাপ্য।

৬। **নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার :** সংগঠককে উদ্যোগী হয়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবকের কাজ করতে হয়। তাকে একদিকে উৎপাদনের খরচ কমাতে হয় এবং অন্যদিকে পণ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি করতে হয়। এ কারণে তাকে সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত, সূক্ষ্ম ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। এসব কাজে অন্যান্য সংগঠক

বা উদ্যোক্তাদের সাথে প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হতে হয়। তাই নতুন পণ্য, নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হয়। এতে নতুন আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত হয়।

সংগঠকের এসব কার্যকলাপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠক বা উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

সারসংক্ষেপ

- ভূমি, শ্রম, পুঁজি প্রভৃতি উপাদানগুলো একত্রিকরণ ও সমন্বয় সাধন করাকে সংগঠন বলে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণে সংগঠনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বর্তমানে সংগঠক বা উদ্যোক্তাকে নানাবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। যেমন, উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ, তত্ত্বাবধান, ঝুঁকি গ্রহণ, বন্টন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৫.৭

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। উৎপাদনের সর্বশেষ উপাদান কি?
ক. পুঁজি খ. কাঁচামাল
গ. সংগঠন ঘ. শ্রমিক
- ২। অর্থনীতিতে সংগঠনের অর্থ কি?
ক. উপাদানের বাজারজাতকরণ
খ. উৎপাদনের উপাদানের সমন্বয়
গ. উৎপাদনের একত্রিকরণ
ঘ. সুদক্ষ কর্মকর্তা ও শ্রমিক নিয়োগ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। সংগঠন বলতে কি বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠকের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

- অনুশীলনী ৫.১ : ১। গ ; ২। ক ; ৩। ক ; ৪। খ।
অনুশীলনী ৫.২ : ১। ক ; ২। ক ; ৩। খ ; ৪। খ।
অনুশীলনী ৫.৩ : ১। খ ; ২। ক।
অনুশীলনী ৫.৪ : ১। খ ; ২। ক।
অনুশীলনী ৫.৫ : ১। খ ; ২। ক।
অনুশীলনী ৫.৬ : ১। ক ; ২। গ।
অনুশীলনী ৫.৭ : ১। গ ; ২। খ।

ইউনিট ৬

বাজার

ভূমিকা

পূর্বের ইউনিটে উৎপাদন এবং এর উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন গড়ে উঠেছে বাজারের চাহিদা ও প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে। মুনাফা সর্বাধিক করার লক্ষ্যে উৎপাদনকারী যেমন বাজার থেকে কম মূল্যে উৎপাদনের উপাদান বা কাঁচামাল সংগ্রহের চেষ্টা করে, তেমনি সেগুলো ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য সর্বাধিক মূল্যে আবার বাজারে বিক্রয় করার চেষ্টা করে। অতএব গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়াতে বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠ ১ : বাজারের অর্থ ও আয়তন

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাজার কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- বাজারের বৈশিষ্ট্য কি কি তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাজারের আয়তনের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- বাজারের আয়তন কোন কোন বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় তা বলতে পারবেন।

বাজার কাকে বলে?

সাধারণ অর্থে বাজার বলতে একটি নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় যেখানে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে কোন পণ্য এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পণ্যের দাম নির্ধারণকারী ক্রেতা ও বিক্রেতাদেরকে বাজার নামে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন— পাটের বাজার, স্বর্ণের বাজার, কাপড়ের বাজার ইত্যাদি।

অর্থনীতিতে বাজারের কয়েকটি উপাদান বা বৈশিষ্ট্য আছে। যথা—

- (ক) ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য এক বা একাধিক দ্রব্য থাকতে হবে।
- (খ) ঐ দ্রব্যগুলোর ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকা চাই। ক্রেতাদের মধ্যে ক্রয়ের বাজারে প্রতিযোগিতা এবং বিক্রেতাদের মধ্যে বিক্রয়ের বাজারে প্রতিযোগিতা থাকে।
- (গ) ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে অবাধ সংশ্রবের ফলে একই সময়ে একই দ্রব্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট দামের উদ্ভব হবে।
- (ঘ) একটি স্থান, অঞ্চল, দেশ বা গোটা পৃথিবী কোন পণ্যের বাজার হতে পারে।

বাজারের আয়তন

সকল পণ্যের বাজার একরূপ হয় না। বাজারের আয়তন ক্ষুদ্র বা বড় হতে পারে। যেমন, মাছ বা দুধের বাজার সংকীর্ণ; কিন্তু গম, সোনা বা কাপড় ইত্যাদি পণ্যগুলোর বাজারের আয়তন বড় হয়। এসব ধরনের পণ্যের বাজার বিশৃঙ্খলাও হয়। নিচে বাজারের আয়তন বা বিস্তৃতি যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা আলোচনা করা হল :

১. চাহিদার বিস্তৃতি : কোন পণ্যের বাজার এর চাহিদার উপর নির্ভর করে। যে পণ্যের চাহিদা যত ব্যাপক তার বাজার তত বিস্তৃত হয়ে থাকে। কিন্তু যে পণ্যের চাহিদা কম তার বাজার সংকীর্ণ হয়ে থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য, গম, কাপড়, তুলা ইত্যাদির বাজার বিস্তৃত হয়। কিন্তু মাছ, দুধ, সবজি ইত্যাদির বাজার খুব সংকীর্ণ এবং ছোট একটি এলাকাতে সীমাবদ্ধ থাকে।

২. যোগান : কোন পণ্যের বাজার বিস্তৃত হতে হলে এর যোগানও বিপুল হতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এত অধিক গম উৎপাদন করতে পারে বলেই তা বিশ্বব্যাপী সরবরাহ করা সম্ভব হয়। তাই এই গমের বাজার বিশ্বব্যাপী। অন্যদিকে, বাংলাদেশের চালের যোগান সীমিত বলে এর বাজার দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

৩. স্থায়িত্ব : যে সব দ্রব্য পচনশীল, ক্ষণস্থায়ী এবং কোথাও পাঠাতে গেলে নষ্ট হয়ে যায়, সে সব দ্রব্যের বাজার সংকীর্ণ হয়। যেমন— তাজা মাছ, পাকা ফল, শাক-সবজি, দুধ ইত্যাদির বাজার সংকীর্ণ। অপরপক্ষে, যে সব দ্রব্য টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী তাদের বাজার বিস্তৃত হয়। যেমন — স্বর্ণ, রৌপ্য, কাপড় ইত্যাদির বাজার বিস্তৃত হয়।

৪. বহনযোগ্যতা : যে সব দ্রব্যের ওজন কম অথচ মূল্য বেশি, সহজে ও অল্প খরচে স্থানান্তর করা যায় সে সব দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি দ্রব্য সহজে বহনযোগ্য তাই তাদের বাজার বিস্তৃত। অপরপক্ষে, যে সব দ্রব্যের আয়তন ও ওজন বেশি এবং স্থানান্তর কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল তাদের বাজার সংকীর্ণ হয়। যেমন— ইটের বাজার।

৫. শ্রেণীবিভাগ ও নমুনাকরণ : যে সমস্ত দ্রব্য গুণাগুণ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং বিদেশে বা দূরতম স্থানে নমুনাসমূহ পাঠিয়ে ক্রেতাদের কাছ থেকে ক্রয়-আদেশ পাওয়া যায়, সে সব দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয়। যে সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের নমুনাকরণের সুবিধা নেই, সে সব দ্রব্যের বাজার সংকীর্ণ হয়ে থাকে।

৬. উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা : বাজারের পরিধি দেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। সড়ক, রেল, জল ও বিমান পরিবহন ব্যবস্থা এবং ডাক, তার, টেলিফোন ইত্যাদি যোগাযোগ মাধ্যমগুলো উন্নত হলে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সহজে সময়মত দূরবর্তী স্থানে পাঠানো সম্ভব হয়। ফলে এসব দ্রব্যাদির বাজার বিস্তৃত হয়।

৭. শান্তি ও নিরাপত্তা : শান্তি ও নিরাপত্তায়ুক্ত পরিবেশের উপরও বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর করে। দেশের ভিতর এবং বাইরে যদি শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে তাহলে নির্বিঘ্নে দ্রব্যাদির আদান-প্রদান চলে। ফলে বাজার বিস্তৃত হয়। অপরপক্ষে, দেশের মধ্যে এবং বাইরে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করলে দ্রব্যের অবাধ চলাচল বিঘ্নিত হয় এবং বাজারের আয়তন হ্রাস পায়।

৮. সরকারের বাণিজ্যনীতি : বাজারের বিস্তৃতি সরকারের বাণিজ্যনীতির উপরও বহুলাংশে নির্ভর করে। সরকার যদি সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে এবং দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানির উপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করে তাহলে দ্রব্যের বাজার সংকুচিত হয়। পক্ষান্তরে সরকার যদি অবাধ ও উদার বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে তাহলে দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয়।

৯. শ্রমবিভাগ : বাজারের বিস্তৃতি অনেক সময় শ্রমবিভাগের মাত্রার উপরও নির্ভর করে। উৎপাদন পদ্ধতিতে যত বেশি মাত্রায় শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করা যায় তত বেশি উৎপাদন হয়। দ্রব্যের মান উন্নত হয়, উৎপাদন ব্যয় কম হয়। কম মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হয়। ফলে দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয়।

১০. প্রচারণা : আধুনিক প্রচারমুখী সমাজে প্রচারণার উপর বাজারের বিস্তৃতি নির্ভর করে। দ্রব্যের গুণাগুণ, দাম ও প্রাপ্তিস্থান, ব্যাপক বিজ্ঞাপন, রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছানো যায়। ফলে সে সব দ্রব্যের বাজার বিস্তার লাভ করে।

সারসংক্ষেপ

- ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দরকষাকষির মাধ্যমে একটি দ্রব্য নির্ধারিত দামে ক্রয়-বিক্রয় হয়। দ্রব্য এবং ক্রেতা ও বিক্রেতাকে বাজার বলে। যেমন— পাটের বাজার, স্বর্ণের বাজার ইত্যাদি।
- বাজারের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে এবং অনেকগুলো বিষয় দ্বারা বাজারের আয়তন নির্ধারিত হয়। যেমন— চাহিদার বিস্তৃতি, যোগান, দ্রব্যের স্থায়িত্ব, পরিবহনযোগ্যতা সরকারের বাণিজ্যনীতি, প্রচারণা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। বাজার কি?
 - ক. গঞ্জ বা হাট যেখানে দ্রব্য বেচাকেনা হয়
 - খ. ক্রেতা ও বিক্রেতা যেখানে মিলিত হয়
 - গ. দ্রব্য এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা
 - ঘ. পণ্য নিয়ে দর কষাকষির স্থান

- ২। কোন দ্রব্যের চাহিদা বিস্তৃত?
ক. মাছ খ. দুধ
গ. সোনা ঘ. শাক-সবজি

রচনামূলক প্রশ্ন :

- ১। বাজারের বিস্তৃতি নির্ধারণকারী বিষয়গুলো আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন :

- ১। বাজার কাকে বলে?
২। বাজারের উপাদান কি কি?

পাঠ ২ : বাজারের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাজারের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- সময়-মেয়াদ অনুসারে বাজারকে কি কি ভাবে ভাগ করা যায় তা বলতে পারবেন।
- প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে কি কি ভাবে ভাগ করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।

আয়তন, সময় এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। এগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করা হল :

(ক) আয়তনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

আয়তন বা পরিধি অনুসারে বাজারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে :

- ১। স্থানীয় বাজার ২। জাতীয় বাজার এবং ৩। আন্তর্জাতিক বাজার।

১। **স্থানীয় বাজার** : যখন কোন পণ্যের বাজার দেশের একটি বিশেষ স্থান বা এলাকা বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে স্থানীয় বাজার বলে। যেমন—টাটকা মাছ বা শাক-সবজির বাজার।

২। **জাতীয় বাজার** : যখন কোন পণ্যের বাজার সারা দেশ জুড়ে বিস্তৃত থাকে তখন তাকে জাতীয় বাজার বলা হয়। যেমন— দেশে উৎপন্ন চাল, গম, শাড়ি, চাদর ইত্যাদির বাজারকে জাতীয় বাজার বলা হয়।

৩। **আন্তর্জাতিক বাজার** : কোন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় যখন দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং কতকগুলো দেশ জুড়ে বিস্তৃত থাকে তখন এই ধরনের পণ্যের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয়। যেমন— পাট, তুলা, স্বর্ণ ইত্যাদির বাজার আন্তর্জাতিক বাজার।

(খ) সময়ের ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণীবিভাগ

অধ্যাপক মার্শাল সময়ের ভিত্তিতে বাজারকে ৪ ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হল :

- ১। অতি-স্বল্পকালীন বাজার, ২। স্বল্পকালীন বাজার, ৩। দীর্ঘকালীন বাজার ও ৪। অতি-দীর্ঘকালীন বাজার।

১। **অতি-স্বল্পকালীন বাজার** : যে বাজার কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন স্থায়ী হয় তাকে অতি-স্বল্পকালীন বাজার বলে। এরূপ বাজারের সময় এতই অল্প যে দ্রব্যের সরবরাহের হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না। এ অবস্থায় দ্রব্যের মূল্য চাহিদা দ্বারাই নির্ধারিত হয়। মাছ ও শাক-সবজির বাজার এরূপ অতি-স্বল্পকালীন বাজার।

২। **স্বল্পকালীন বাজার** : স্বল্পকালীন বাজারে পণ্যের যোগান কিছুটা বাড়ানো বা কমানো যায় এবং যদি চাহিদা কমে তবে যোগানও কিছুটা কমানো যায়। তবে এটুকু সময়ের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন বা সংখ্যা পরিবর্তন করা যায় না।

৩। দীর্ঘকালীন বাজার : যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদার সাথে সাজা দিয়ে যোগান পরিবর্তন করা যায় তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলা হয়। চাহিদা বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে এ সময়ের মধ্যে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, আয়তন, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে চাহিদার সাথে যোগানের সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

৪। অতি-দীর্ঘকালীন বাজার : যে বাজারে উৎপাদনকারীর কাছে এত অধিক সময় থাকে যে, দ্রব্যের চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো যায় এরূপ বাজারকে অতি-দীর্ঘকালীন বাজার বলা হয়। কিন্তু এই বাজারে সময়ের ব্যবধানে ক্রেতার সংখ্যা রুচি ও অভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে পারে। ফলে উৎপাদনকারীর ধারণার বাহিরে চাহিদারও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

(গ) প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও ২। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। এই দুই ধরনের বাজারের বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

১। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার : যখন কোন সমজাতীয় (অর্থাৎ একজাতীয়) দ্রব্যের বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে এবং তাদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজ করে তখন তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়।

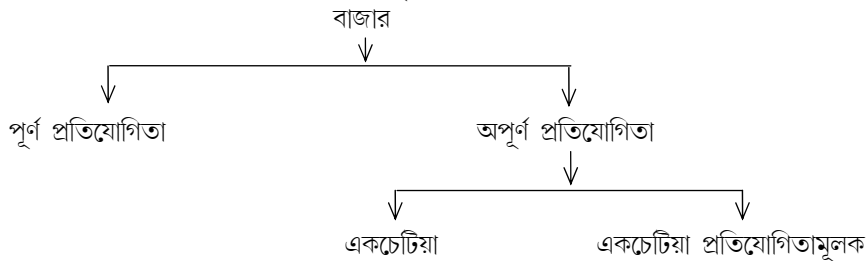
২। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার : যখন কোন দ্রব্যের বাজারে কম সংখ্যক ক্রেতা বা বিক্রেতা থাকে, যার ফলে তাদের মধ্যে যে কোন একজনের আচরণ মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন বাজারকে আংশিক বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১) একচেটিয়া বাজার ও (১) একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

(১) একচেটিয়া বাজার : যখন বাজারে কোন দ্রব্যের মাত্র একজন বিক্রেতা থাকে বা একটি মাত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান দ্রব্যটির মোট যোগান নিয়ন্ত্রণ করে তখন তাকে একচেটিয়া বাজার বলে।

(২) একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার : যখন বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা সম্পূর্ণ এক না হয়েও প্রায় একই ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করে তখন তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

নিচে একটি ছকের সাহায্যে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের শ্রেণীবিভাগ দেখানো হল :



সারসংক্ষেপ

- আয়তনের ভিত্তিতে এবং সময়ের পরিসর অনুসারে বাজারের বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীবিভাগ হতে পারে। যেমন— স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার। আবার অতি-স্বল্পকালীন, স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন ও অতি-দীর্ঘকালীন বাজার।
- প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের বিভিন্ন পণ্য ও সেবার বাজার

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বিপণনের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের বিপণন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্বভাবগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশে বিপণন কাজে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- কৃষিপণ্য বিপণনে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কি কি তা বলতে পারবেন।
- শিল্প সামগ্রী বিপণনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কি কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।

বিপণন

দ্রব্যসামগ্রী তৈরি বা প্রস্তুত হওয়ার পর উৎপাদনকারীর কাছ থেকে এগুলো ভোক্তার কাছে নিয়মিত ও অবিরাম ধারায় প্রবাহিত করার যাবতীয় কার্যাবলীকে বিপণন বা বাজারজাতকরণ বলা হয়। এ দ্বারা সমাজের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বিপণন এমন এক কার্যক্রম যা ভোক্তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন আবিষ্কার করে, সে অনুযায়ী পণ্য বা সেবা উৎপন্ন করে এবং চাহিদা সৃষ্টি বা বৃদ্ধির কাজে ব্যাপৃত থাকে। সুতরাং বলা যায় যে উৎপাদনের সাথে ভোগের সেতুবন্ধন সৃষ্টিই হচ্ছে বিপণনের কাজ।

বাংলাদেশে বিপণন কাজের বর্ণনা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উৎপাদনকারীগণ মোট উৎপাদনের অধিকাংশই নিজে ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত কৃষিভিত্তিক অনুন্নত দেশগুলোতে এটি একটি স্বাভাবিক অবস্থা। জনসংখ্যাধিক্যের কারণেই এরূপ ঘটে।

বিপণনের কাজ হল কোন জিনিসকে উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ কাজে যে সকল লোক ও সম্পদ নিয়োজিত আছে, তারা প্রধানত পরিবহন, যোগাযোগ, গুদামজাতকরণ, অর্থ যোগানদান, বীমা ব্যবসা, সংবাদ সরবরাহ এবং ক্রয় ও বিক্রয়ের কাজ করে থাকে। এ কাজগুলো কত স্বল্প ব্যয়ে ও যথাসময়ে কতটা করা সম্ভব তার উপরই সমগ্র দেশের বিপণন ব্যবস্থা নির্ভর করছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের সাথে সাথে বিপণন ক্ষেত্রেও যোগ্যতা ও দক্ষতার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন— পরিবহন বা গুদামজাতকরণের কাজ সেকালেও ছিল এবং বর্তমানকালেও করতে হয়। কিন্তু আগের দিনে পণ্যসামগ্রী এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়া হত পশুর পিঠে করে, সেখানে বর্তমানে স্টিমার, রেলগাড়ি ও উড়োজাহাজে একাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। তেমনি পুরাতন গোলাঘরের বদলে এখন গুদামজাতের জন্য হিমাগার ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমান কালে মোড়কের জন্য উন্নতমানের দ্রব্যাদি বা মাল-মসলা ব্যবহার করা হচ্ছে। আধুনিককালে আকর্ষণীয় মোড়কের প্রতি মানুষ অধিক ঝুঁকিয়েছে। তেমনি দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা নমুনার উপর ভিত্তি করে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

বাংলাদেশে বিপণন কাজে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণনা ও শ্রেণীবিভাগ

কি ধরনের প্রতিষ্ঠান এই বিপণন কাজ সম্পন্ন করবে তা দ্রব্যের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যেমন, মিলের প্রস্তুত কাপড় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রয় করতে হবে। সুতরাং এ কাজের জন্য প্রধানত কয়েক শ্রেণীর এবং কয়েক স্তরের মধ্যস্থ কারবারির প্রয়োজন। মিল থেকে প্রথমত পাইকারি বিক্রেতা বা হোলসেলার এই কাপড় নিয়ে আসে এবং তার কাছ থেকে খুচরা বিক্রেতা বা রিটেলার নিয়ে যায় এবং খরিদারের কাছে বিক্রি করে। কিন্তু কৃষিজাত পণ্যের বেলায় প্রথমত পল্লীর বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে ফরিয়া বা ছোট বেপারি অল্প পরিমাণে কৃষিজাত পণ্য, যেমন— তরকারি কিনে আনে। গ্রাম বা হাট থেকে কেনা এই তরকারি শহরে এনে তারা বড় বেপারি বা আড়তদারের কাছে বিক্রি করে। এরপর খুচরা বিক্রেতার এগুলো কিনে আনে এবং ভোগকারি ক্রেতার কাছে বিক্রয় করে। আবার সবসময় যে মধ্যস্থতাকারী প্রয়োজন হয় এমন নয়। যেমন— গ্রামের তাঁতিরা কাপড় বানিয়ে নিজেরাই হাটে বা বাজারে বিক্রি করে। আবার যাদের তাঁত অনেকগুলো, বেশ কিছু কাপড় তৈরি করে তারা কিন্তু মহাজনের ঘরে গিয়ে ঐ কাপড় বিক্রি করে। এখানে মধ্যস্থতাকারীর অনুপ্রবেশ ঘটে। আলু উৎপাদনকারী কৃষকগণের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা তাদের উদ্ভূত পণ্য হাটে বা বাজারে বিক্রি করতে পারে কিন্তু বেশি পরিমাণে উৎপাদনকারীরা তাদের পণ্য হিমাগারে ভাড়ার বিনিময়ে রাখে। পাইকারি বিক্রেতারও হিমাগারে এগুলো গুদামজাত করে।

বাংলাদেশে বিপণন কাজে যে সকল প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে তাদেরকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১। কৃষিজ পণ্য বিপণনে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ২। শিল্পে উৎপাদিত সামগ্রীসমূহের বিপণনে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ।

যে সকল প্রতিষ্ঠান কৃষিজাত পণ্য বিপণন কাজে নিযুক্ত তারা হল :

- (ক) ফড়িয়া ও বেপারি ;
 - (খ) আড়তদার, গোলাদার, দালাল ;
 - (গ) পাইকারি ব্যবসায়ী, (পাট বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পরবর্তী ধাপে থাকে বেলার, শীপার ও কারখানা) ;
 - (ঘ) কৃষিজাত পণ্যের খুচরা ব্যবসায়ী এবং
 - (ঙ) ক্রয়-বিক্রয়ে নিযুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- এছাড়াও রয়েছে ব্যাংক, বীমা কোম্পানি ইত্যাদি সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ।

অনুরূপভাবে শিল্পসামগ্রী বিপণনে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হল :

- (ক) উৎপাদকের এজেন্ট ;
 - (খ) হোলসেলার বা পাইকারি বিক্রেতা ;
 - (গ) কমিশন এজেন্ট ;
 - (ঘ) ডিস্ট্রিবিউটর এবং
 - (ঙ) খুচরা বিক্রেতা।
- এছাড়াও রয়েছে ব্যাংক, বীমা কোম্পানি ইত্যাদি সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান।

সারসংক্ষেপ

- বিপণন হল এমন একটি কার্যক্রম যা ভোক্তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন আবিষ্কার করে সে অনুযায়ী পণ্য ও সেবা উৎপাদন করে, চাহিদা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির কাজে ব্যাপৃত থাকে এবং কোন পণ্যকে উৎপাদকের কাছ থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। বিপণনের কাজ কি?
 - ক. বিক্রয় করা ও উৎপাদন করা
 - খ. উৎপাদনের সঙ্গে ভোগের সেতু সৃষ্টি করা
 - গ. ভোক্তার চাহিদা আবিষ্কার করা
 - ঘ. উৎপাদন করা ও প্রয়োজনমত যোগান দেয়া
- ২। মিল থেকে কারা কাপড় নিয়ে আসে?
 - ক. মহাজন
 - খ. খুচরা বিক্রেতা
 - গ. পাইকারী বিক্রেতা
 - ঘ. দালাল
- ৩। বাংলাদেশে বিপণন কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
 - ক. চার ভাগে
 - খ. দুই ভাগে
 - গ. পাঁচ ভাগে
 - ঘ. ছয় ভাগে

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বিপণন কি? বাংলাদেশে বিপণন কাজে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণনা দিন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। বিপণন কাকে বলে?
- ২। কৃষিপণ্য বিপণনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলো কি কি?
- ৩। শিল্প সামগ্রী বিপণনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম লিখুন।

পাঠ ৪ : বাংলাদেশের কৃষিপণ্যের বাজার : পাটের বিপণন

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- পাট বিপণনের গুরুত্ব কি কি তা বলতে পারবেন।
- পাট বিপণনে সম্পাদিত কার্যাবলী কি কি বলতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির স্বরূপ নির্ধারণে কৃষিপণ্যের শ্রেণীবিভাগ, প্যাকিং, সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে বংশ পরম্পরায় যে প্রাগৈতিহাসিক পদ্ধতি পালিত হয়ে আসছে তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশের কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় বহু ত্রুটি লক্ষণীয়। পণ্যের উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যবর্তী পর্যায়ে অগণিত মধ্যস্থত্বভোগী ব্যবসা চালিয়ে পণ্যের বিক্রয়মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি করে।

বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যই জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস। এই পণ্যগুলো হচ্ছে — ১। চাউল, ২। পাট, ৩। চামড়া, ৪। চা, ৫। তামাক, ৬। তৈলবীজ, ৭। ডাল, ৮। শাক-সবজি, ৯। আম, ১০। পান ইত্যাদি।

পাট বিপণন

পাট বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড এবং অন্যতম প্রধান রফতানিযোগ্য সম্পদ। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র পাটের চাষ করা হয়। মোট আবাদি জমির মাত্র ৭% জমির পাট চাষ থেকে ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। দেশের ৭৭টি পাটকলে প্রতি বছর আনুমানিক ৩০ লাখ বেল কাঁচা পাট সরবরাহ করার পরও প্রায় ১০ থেকে ২০ লাখ বেল কাঁচা পাট উদ্বৃত্ত থাকে (এক বেলে ২ কুইন্টালের চেয়ে কিছু কম পাট থাকে)। শুধু পাট চাষে নিয়োজিত কৃষক ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিকের কথা বিবেচনা করে পাটকে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ বলা হয়। পাট দু'শ্রেণীর হয়। যথা :

(১) সাদা দেশী পাট ও

(২) তোষা পাট।

মোট উৎপাদিত পাটের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই সাদা পাট। মানের উপর ভিত্তি করে পাটকে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

পাট বিপণনে বিভিন্ন স্তর বা মধ্যস্থ কারবারি

বাংলাদেশে পাট বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো মধ্যস্থত্বভোগী কারবারি জড়িত থাকে। পাট বন্টন প্রণালীতে এসব মধ্যস্থকারবারী বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনকারী কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্যের সামান্য অংশ মাত্র পায়। মধ্যস্থ কারবারিরাই মুনাফার বেশিরভাগ অংশ ভোগ করে।

এসব মধ্যস্থ কারবারিদের নিয়ে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

বেপারি বা ফড়িয়া : পাটের বন্টন প্রণালীর প্রথম ধাপেই কর্মরত থাকে অসংখ্য বেপারি বা ফড়িয়া। তারা বাংলাদেশে পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলোতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাট সংগ্রহ করে। এছাড়া উৎপাদকরা পাট বিক্রয়ের জন্য হাটে নিয়ে আসে। সেখানে ফড়িয়ারা উৎপাদকদের সাথে দরকষাকষি করে পাটের দাম ঠিক করে।

আড়তদার ও দালাল : আড়তদার এমন এক মধ্যস্থ কারবারি যে বেপারি, ফড়িয়া এবং উৎপাদককে পাটের ক্রেতা খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। আড়তদার একদিকে উৎপাদক, বেপারী বা ফড়িয়া এবং অন্যদিকে বেলার ও মিলের মধ্যবর্তী পর্যায়ে কাজ করে। এ দু'পক্ষের যোগসূত্র হিসেবে আড়তদার কাজ করে। আড়তদারদের সংরক্ষণাগার থাকে এবং যারা এই সংরক্ষণাগারে পাট বিক্রির আগ পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে চায় তাদের কাছ থেকে কমিশন আদায় করা হয়। সাধারণত আড়তদারগণ কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করে।

দালাল : দালাল বা ব্রোকারও একজন মধ্যস্থত্বকারী। তার প্রধান কাজ হলো ক্রেতা ও বিক্রেতাদেরকে পরস্পরের সান্নিধ্যে আনয়ন করা। এজন্য সে কমিশন বা মুনাফার অংশ লাভ করে।

কাঁচা বেলার : কাঁচা বেলার খোলা পাট ক্রয় করে। মান অনুসারে পাটগুলোকে আলাদা আলাদা করার পর কাঁচা বেলে রূপান্তর করে। কাঁচা বেলার যে গাইট তৈরি করে তা কাঁচা গাইট নামে পরিচিত।

বেল করা পাটের দালাল : এরা শুধুমাত্র বেল করা পাট নিয়ে কারবার করে। এসব দালালদের কাজ হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে বেল করা পাটের লেনদেন সম্পন্ন করা।

স্বাধীনতার পর একাধিক সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান পাট ক্রয় করছে। যথা—

(ক) জুট মার্কেটিং করপোরেশন ও (খ) বাংলাদেশ জুট করপোরেশন।

পাট বিপণনে সম্পাদিত কার্যাবলী

১. **ক্রয়-বিক্রয়** : বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক দরিদ্র ও নিরক্ষর। নগদ অর্থের প্রয়োজন থাকতে ফসল তোলার পরপরই তারা স্বল্প দামে পাট বিক্রি করে দেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে খোলাখুলি দরকষাকষির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারিত হয় এবং প্রাথমিকভাবে গুণাগুণ নির্ধারণ করা হয়। কখনো কখনো ক্রয়ের এক অংশ বাকিতে করা হয়।

মধ্যস্থতাকারীদের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও পাটের মূল্য উঠানামার পশ্চাতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অন্যতম কারণ। সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনেকেরই না থাকার কারণে তারা ক্রয়ের পরই তা বিক্রি করতে চায়।

২. **গুদামজাতকরণ** : প্রাথমিক স্তরে পাটের গুদামজাত করা হয় সাধারণত ব্যবসায়ীর বাড়ীতে বা অল্প সময়ের জন্য নদীর ঘাটে বা নৌকায়। বাংলাদেশে পাট গুদামজাত করার মত গুদাম খুবই সীমিত। তবে বেশিরভাগ কাঁচা বেলার তাদের নিজেদের গুদামে বা ভাড়া করা গুদামে পাট গুদামজাত করে।

৩. **শ্রেণীবিভাগ** : প্রাথমিক মধ্যস্থ কারবারিরা সঠিকভাবে পাটের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক শ্রেণী বা গ্রেডের নাম জানে না। কৃষকদেরও গ্রেড সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব থাকায় তারা সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪. **পরিবহণ** : বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে ভারী পাটকে নৌকায় করে বহন করা হয়। অন্যদিকে কাঁচা বেলাররা রেলওয়ে ও ট্রাকের উপর নির্ভর করে।

৫) **অর্থসংস্থান** : বেপারি ও ফড়িয়ারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজ টাকায় ব্যবসা করে। কেউ কেউ আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে পুঁজি চুক্তিভিত্তিতে নিয়ে কারবার করে। কাঁচা বেলাররা নিজ অর্থ বিনিয়োগের সাথে সাথে ব্যাংক থেকে যথেষ্ট সুবিধা পায়।

সারসংক্ষেপ

- পাট প্রধানত দুই ধরনের : সাদা দেশী ও তোষা। সাধারণত যেসব মধ্যস্থত্বভোগী পাট বিপণনে জড়িত থাকেন তারা হচ্ছেন : বেপারি বা ফড়িয়া, আড়তদার ও দালাল, কাঁচা বেলার ও বেল করা পাটের দালাল।

পাটোত্তর মূল্যায়ন : ৬.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির শতকরা কত ভাগে পাট চাষ করা হয়?

- ক. ১২ খ. ১৫
গ. ৭ ঘ. ৪

২। বাংলাদেশের ৭৭টি পাটকলে বছরে কত লাখ বেল পাট সরবরাহ করা হয়?

- ক. ৫০ খ. ৬২
গ. ২৫ ঘ. ৩০

৩। এক বেলে প্রায় কত কুইন্টাল পাট থাকে?

- ক. ৫ খ. ৬
গ. ২ ঘ. ৪

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। পাট বিপণনের স্তরসমূহের মধ্যস্থ কারবারীদের বর্ণনা দিন।
- ২। পাট বিপণনে সম্পাদিত কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। পাট বিপণনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ৬.১ : ১। গ ; ২। গ

অনুশীলনী ৬.২ : ১। খ ; ২। গ ; ৩। গ

অনুশীলনী ৬.৩ : ১। খ ; ২। গ ; ৩। খ

অনুশীলনী ৬.৪ : ১। গ ; ২। ঘ ; ৩। গ

ইউনিট ৭

জাতীয় আয়

ভূমিকা

জাতীয় আয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন দেশের সমৃদ্ধি জাতীয় আয়ের মাধ্যমে বিচার করা হয়। কোন ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান যেমন তার ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভর করে, তেমনি একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান সে দেশের জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে। জাতীয় আয়ের পরিমাণ একটি দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তাই একটি দেশের মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে জাতীয় আয়ের ধারণাটি বুঝতে সহজ হবে। এ ছাড়া যেহেতু ব্যক্তির আয়ের উপর তার জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে তাই মাথাপিছু আয়ের ধারণার সাথে আমাদের পরিচয় থাকা প্রয়োজন। জাতীয় আয় বাড়লে মাথাপিছু আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ে। আলোচ্য পাঠে জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়, বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

পাঠ ১ : জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- জাতীয় উৎপাদন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জাতীয় আয়ের বিবরণ দিতে পারবেন।
- জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

জাতীয় উৎপাদন

উৎপাদন সম্পর্কে আমরা পূর্বের ইউনিটে জেনেছি। এবার আসুন জাতীয় উৎপাদন কি, সে সম্পর্কে জেনে নিই। একটি দেশের অধিবাসীরা সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে। কোন দেশ এক বছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তাকে সে দেশের জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। যেমন— কৃষক কৃষিপণ্য উৎপাদন করে, শ্রমিক কারখানায় শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে, খনির শ্রমিক খনি হতে খনিজদ্রব্য উৎপাদন করে, শিক্ষক শিক্ষকতা করে, ডাক্তার রোগী দেখে ইত্যাদি। এসব কাজকর্মের ফলে কোন দেশে এক বছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সৃষ্টি হয় তাদের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে।

উৎপাদন চলার সময় কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রমশ পুরাতন ও অকেজো হয়ে পড়ে, অর্থাৎ অবচয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু উৎপাদন চালু রাখতে হলে এগুলো মেরামত করা বা বদলানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মোট জাতীয় উৎপাদন হতে এসব ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ বরাদ্দ অর্থ বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়।

জাতীয় আয়

আমাদের দেশে ইটের ভাটায় উৎপাদিত একটি ইটের কথাই ধরুন। এই ইটটির একটি মূল্য আছে। অর্থাৎ অর্থ দিয়ে এটিকে ক্রয় করতে হয়। অনুরূপভাবে জাতীয় উৎপাদনেরও মূল্য আছে। আর কোন দেশের শ্রম ও মূলধন সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার সৃষ্টি করে তার মোট আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে। জাতীয় আয় হিসাব করার সময় মোট জাতীয় আয় হতে যন্ত্রপাতি, কারখানা গৃহ, প্রভৃতির ক্ষয়-ক্ষতিজনিত ব্যয়, বৃদ্ধ বয়সের ভাতা, বে-আইনী কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত আয়, দেশে অবস্থানরত বিদেশীদের আয় বাদ দিতে হয় এবং উক্ত দেশের নাগরিকদের বিদেশ হতে প্রাপ্ত আয় যোগ করতে হয়। তাছাড়া জাতীয় আয় হিসাবের সময় একই দ্রব্যের দাম যাতে দুবার যোগ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন, বইয়ের দাম হিসাবের সময় কাগজের দাম যাতে আলাদাভাবে ধরা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।

জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের মধ্যে পার্থক্য

জাতীয় আয় এবং জাতীয় উৎপাদন— এই ধারণা দুটি পরস্পর এক নয়। সাধারণত জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায় :

- ১। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) কোন দেশের মোট উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা কর্মের সমষ্টিকে জাতীয় উৎপাদন বলে। জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে।
- ২। জাতীয় আয়ের ধারণা কিছুটা সংকীর্ণ কিন্তু জাতীয় উৎপাদনের ধারণাটা ব্যাপক। জাতীয় উৎপাদন হিসাব করার সময় মূলধন দ্রব্যের (যন্ত্রপাতি, কারখানা গৃহ ইত্যাদির) ক্ষয়-ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দেওয়া হয় না। জাতীয় আয় হিসাব করার সময় এ ব্যয় বাদ দেওয়া হয়।
- ৩। জাতীয় উৎপাদন বস্তু ও সেবার পরিমাণ বা অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু জাতীয় আয় শুধু অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

মাথাপিছু আয়

পৃথিবীর দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোর অন্যতম দক্ষিণ এশিয়া। বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ২২ ভাগ দক্ষিণ এশিয়ায় বাস করে। কিন্তু বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকের বাস এই দক্ষিণ এশিয়ায়। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের মাথাপিছু আয় খুবই কম। কোন দেশের মানুষের গড় জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা করতে হলে মাথাপিছু আয়ের হিসাব করতে হবে। তাই মাথাপিছু আয় কাকে বলে সেটা জানা প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{দেশের জনসংখ্যা}}$$

সাধারণত মাথাপিছু আয় দ্বারা কোন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা হয়।

সারসংক্ষেপ

- একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) কোন দেশের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকর্মের সমষ্টিকে জাতীয় উৎপাদন বলে। মোট জাতীয় উৎপাদন হতে ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ বরাদ্দ অর্থ বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়।
- জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে?
 - ক. এক বছরে কোন দেশে মোট উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা
 - খ. একটি দেশে উৎপাদিত যাবতীয় ভোগ্য দ্রব্য
 - গ. একটি জাতির ধন সম্পত্তি ও ভূখণ্ড
 - ঘ. একটি দেশের জনগণের আয় ও বৈদেশিক সাহায্য
- ২। জাতীয় আয় কাকে বলে?
 - ক. উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা কর্মের বিক্রয়লব্ধ অর্থ
 - খ. উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ
 - গ. উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্য
 - ঘ. রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত আয়
- ৩। জাতীয় আয় किसের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়?
 - ক. দ্রব্যের পরিমাণের মাধ্যমে
 - খ. অর্থের মাধ্যমে
 - গ. দ্রব্যের পরিমাণ ও সেবাকর্মের মাধ্যমে
 - ঘ. উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের মাধ্যমে।

পাঠ ২ : বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ ও তাদের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষিদ্রব্য, শিল্পদ্রব্য ও খনিজদ্রব্যের বিবরণ দিতে পারবেন।

বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অনগ্রসর ও দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম। এ দেশের অর্থনীতি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এখানকার উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষি ভিত্তিক। আমাদের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান এখনও এককভাবে সবচেয়ে বেশি। রপ্তানি বাণিজ্যে এই খাতের অবদান অন্যান্য খাতের তুলনায় বেশি। এদেশের কর্মক্ষম লোকের সিংহভাগ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত। কৃষির তুলনায় অন্যান্য খাতের উল্লেখযোগ্য বিকাশ আমাদের দেশে এখনও সম্ভব হয়নি। তাই জাতীয় আয়ে শিল্প ও অন্যান্য খাতের অবদান খুবই নগণ্য। অথচ শিল্পের উন্নতি ছাড়া একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। মূলধনের অভাব, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, বিনিয়োগের পরিবেশের অভাব প্রভৃতি আমাদের দেশের শিল্পের উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানে এ দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা যুগোপযোগী অর্থাৎ শিল্পভিত্তিক করার চেষ্টা চলছে।

উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ ও তাদের শ্রেণীবিভাগ :

বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— ১। কৃষিজাত দ্রব্য; ২। শিল্পজাত দ্রব্য ও ৩। খনিজ দ্রব্য।

১। কৃষিজাত দ্রব্য :

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের বেশিরভাগ লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। এদেশ পলিগঠিত সমভূমি বলে এদেশের মাটি খুবই উর্বর। বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ ১.৪ কোটি হেক্টর। এর মধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৯০ লক্ষ হেক্টর। পল্লী এলাকার শতকরা ৮০ ভাগ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে এই কৃষিখাতে। জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ এ খাত থেকে আসে। তাই জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব এত বেশি।

বাংলাদেশের কৃষিদ্রব্যসমূহকে চার ভাগে ভাগ করা যায়: যথা— ১। শস্য; ২। বন;

৩। পশুপালন ও ৪। মৎস্য।

১। শস্য : বাংলাদেশে উৎপাদিত শস্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল। যেসব শস্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে খাদ্যশস্য বলে। আর যেসব শস্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে (অর্থাৎ বাজারে বিক্রি বা বিদেশে রপ্তানি করার জন্য) উৎপাদন করা হয় তাকে অর্থকরী ফসল বলে। বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে চাউল, ডাল, গম, আলু, তৈলবীজ, নানারকম ফল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদেশের মোট আবাদি জমির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়। এছাড়া পাট, চা, আখ, তামাক, তুলা, রেশম প্রভৃতি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল।

২। বন : বন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশের মোট আয়তনের কমপক্ষে শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কারণ ভূমির ক্ষয়রোধ, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষা, বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির জন্য বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা ১৩ ভাগ বনভূমি রয়েছে। বাংলাদেশের বনভূমিকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়; যথা— ১। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি; ২। সিলেটের বনাঞ্চল; ৩। সুন্দরবন; ৪। মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি এবং ৫। দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমি।

বাংলাদেশের বনভূমিতে যেসব বৃক্ষ দেখা যায় তার মধ্যে সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওড়া, গর্জন, সেগুন, চাপালিস, গামারি, শিরীষ, শাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সুন্দরবনে গোলপাতা এবং সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে প্রচুর বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়। ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, নৌকা, রেলওয়ের স্লিপার, খুঁটি প্রভৃতি তৈরিতে এসব গাছের কাঠ

ব্যবহার করা হয়। বন থেকে আমরা জ্বালানি কাঠও পেয়ে থাকি। বন হতে মধু, মোম, গোলপাতা, কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করে অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করে।

৩। পশুপালন : আমাদের অর্থনীতিতে পশুসম্পদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পশুসম্পদের অধিকাংশই গৃহপালিত পশু। এর মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া হাঁস, মুরগি, কবুতর প্রভৃতি পাখিও গৃহে পালন করা হয়। প্রাণিজ আমিষ, যেমন— দুধ, মাংস ও ডিম গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি হতে পাওয়া যায়। হালচাষ, গ্রামীণ পরিবহন, শস্য মাড়াই প্রভৃতি কাজে পশু ব্যবহার করা হয়। দেশের চাষযোগ্য জমির প্রায় সবটুকুই গবাদি পশু দ্বারা চাষ করা হয়। গবাদিপশুর চামড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। গ্রামীণ জনগণের এক বড় অংশ হাঁস, মুরগি, গরু ও ছাগল পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। আমাদের দেশের গ্রামের গরিব, বেকার ও দুঃস্থ মহিলাদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে উৎসাহিত করতে পারলে অতিরিক্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে বেকারদের স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে।

৪। মৎস্য : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাছ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এদেশে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুর। এছাড়া সমুদ্র হতেও মাছ পাওয়া যায়। দেশের ভিতরের জলাশয় থেকে যে মাছ পাওয়া যায় তাকে মিঠা পানির মাছ বলে। সমুদ্র থেকে যে মাছ পাওয়া যায় তাকে লোনা পানির বা সামুদ্রিক মাছ বলে। মিঠা পানির মাছের মধ্যে রয়েছে— রুই, কাতলা, মৃগেল, মাগুর, সরপুটি, পাঙ্গাস, ইলিশ, চিতল, বোয়াল, কই, সিং প্রভৃতি। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে রয়েছে— চাঁদা, রূপচাঁদা, ভেটকি, গলদা চিংড়ি প্রভৃতি। দেশে বছরে প্রায় ৮ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপন্ন হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রায় ১২ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে। মাছ দেশের প্রাণিজ আমিষের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ সরবরাহ করে।

শিল্পজাত দ্রব্য :

বাংলাদেশে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১। বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্য, ২। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাতদ্রব্য এবং ৩। কুটির শিল্পজাত দ্রব্য।

বাংলাদেশের বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে পাট, বস্ত্র, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, সার, লৌহ ও ইস্পাত, দিয়াশলাই, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে পোশাক শিল্প, চামড়া ট্যানিং, জুতা তৈরি, ডেয়ারি ফার্ম, বেকারি, চাল ও আটার কল, হোসিয়ারি, করাত কল, আসবাবপত্র তৈরি, সাবান, তেল, প্লাস্টিক, পাউডার, চীনা মাটি, এলুমিনিয়াম ও মেলামাইনের বাসনপত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কুটির শিল্পের মধ্যে তাঁতের কাপড়, রেশমি বস্ত্র, মাটির পাত্র, কাঁসা-পিতলের দ্রব্য, বেত ও বাঁশের তৈরি দ্রব্য, চামড়া শিল্প, সাবান (বিশেষ করে কাপড় ধোয়া সাবান), শাঁখা, বই বাঁধাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ শিল্পে তেমন উন্নত নয়। জাতীয় আয়ে এ খাতের অবদান খুবই কম। দেশের শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খনিজ দ্রব্য :

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। অথচ শিল্পের উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশে খুব বেশি খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়নি। মূলধন ও কারিগরি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের খনিজ সম্পদ জরিপ, অনুসন্ধান ও উত্তোলনের কাজ সন্তোষজনক নয়। আমদানির মাধ্যমে আমাদের খনিজ সম্পদের প্রয়োজন মেটাতে হয়। এদেশের উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, সিলিকা-বালু, চীনা মাটি, পেট্রোলিয়াম, গন্ধক, তামা, কঠিন শিলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ব্রিচিং পাউডার, সিমেন্ট, চক, ইস্পাত, রং, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি এবং সার শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গন্ধক ও বারুদ দিয়াশলাই শিল্পে ব্যবহার করা হয়। কঠিন শিলা গৃহ নির্মাণ, রেললাইন, বাঁধ ও রাস্তাঘাট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। কাচ, রং, অগ্নিরোধক ইট প্রভৃতি তৈরিতে সিলিকাবালু ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষিভিত্তিক। এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১। কৃষিজাত দ্রব্য ; ২। শিল্পজাত দ্রব্য ও ৩। খনিজ দ্রব্য।
- কৃষিজাত দ্রব্যকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১। শস্য; ২। বন; ৩। পশুপালন ও ৪। মৎস্য।
- শিল্পজাত দ্রব্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১। বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্য, ২। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্য ও ৩। কুটির শিল্পজাত দ্রব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন :

- ১। বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫
- ২। বাংলাদেশের কৃষিজাত দ্রব্যসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫
- ৩। বাংলাদেশের বনভূমিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫
- ৪। বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ কত কোটি হেক্টর?
ক. ১.২ কোটি হেক্টর খ. ১.৪ কোটি হেক্টর
গ. ১.৬ কোটি হেক্টর ঘ. ১.৮ কোটি হেক্টর
- ৫। বাংলাদেশে উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয়? এ দেশের শিল্পখাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
- ২। বাংলাদেশের কৃষিজাত দ্রব্যসমূহকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয়? এ দেশের বনজ সম্পদের বর্ণনা দিন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ৭.১ : ১। ক, ২। গ, ৩। খ, ৪। গ।

অনুশীলনী ৭.২ : ১। খ, ২। গ, ৩। ঘ, ৪। খ। ৫। খ

ইউনিট ৮

বন্টন

ভূমিকা

অর্থনীতি যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তার মধ্যে বন্টন গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আয় কিভাবে বন্টিত হয় তা বন্টনতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। সমাজের মোট উৎপাদনের বন্টন নির্ভর করে আয় বন্টনের উপর। যাদের হাতে বেশি অর্থ আছে তাদের ক্রয় ক্ষমতাও বেশি এবং তারাই সমাজের মোট উৎপাদনের সিংহভাগ ভোগ করে। আর যাদের আয় কম তাদেরকে মোট ভোগা দ্রব্যের সামান্য অংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেই বলা যাবে না যে, একটা দেশের মানুষের দারিদ্র কমছে, তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ জাতীয় আয়ের এই বৃদ্ধি যদি মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তবে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না। কোন দেশের সমৃদ্ধির জন্য যেমন আয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সে আয়ের সুসম বন্টন। তাই উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের আয় বা পারিশ্রমিক কিভাবে নির্ধারিত হয় তা জানা প্রয়োজন। এই ইউনিটে জানা যাবে বন্টন কাকে বলে, কাদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং কিসের ভিত্তিতে বন্টন করা হয়। তাছাড়া বাংলাদেশের বন্টন ব্যবস্থার উপরও আলোকপাত করা হবে।

পাঠ ১ : বন্টনের ধারণা — উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে বন্টন

উদ্দেশ্য :

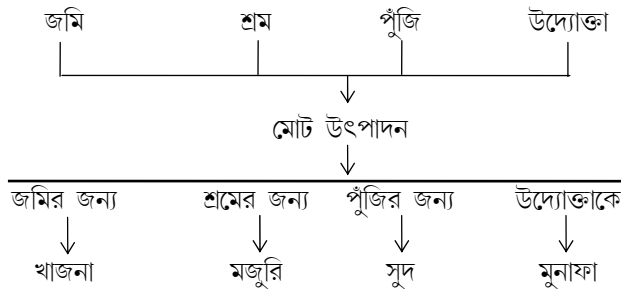
এ পাঠ শেষে আপনি—

- বন্টন কাকে বলে বলতে পারবেন।
- কি বন্টন করা হবে এবং কাদের মধ্যে বন্টন করা হবে বলতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত আয় বন্টন ও ক্রিয়াগত আয় বন্টনের পার্থক্য বলতে পারবেন।

বন্টন

অর্থনীতি মূলত জাতীয় আয়ের উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ নিয়ে আলোচনা করে। উৎপাদনে বিভিন্ন উপকরণ (যেমন— জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন) অংশগ্রহণ করে। এর বিনিময়ে এরা পারিশ্রমিক পায়। জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে পারিশ্রমিক বা দাম দেওয়া হয় তাকে খাজনা বলে। শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পায় তাকে মজুরি বলে। পুঁজি ব্যবহারের জন্য পুঁজির মালিককে দেওয়া হয় সুদ এবং সংগঠক বা উদ্যোক্তা পায় মুনাফা। উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপকরণগুলোর মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বন্টন করা হয় বন্টনতত্ত্বে তাই আলোচনা করা হয়। অর্থনীতিতে বন্টন বলতে উৎপাদনে যেসব উপকরণ অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে জাতীয় আয় ভাগ করাকে বুঝায়। একে ক্রিয়াগত আয় বন্টন বলে। অর্থনীতি ক্রিয়াগত আয় বন্টন নিয়ে আলোচনা করে।

ক্রিয়াগত বন্টন নিচের ছকের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে :



বন্টন অধ্যায়ে আমরা তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাই। এগুলো হচ্ছে : (১) কি বন্টন করা হবে ; (২) কাদের মধ্যে বন্টন করা হবে এবং (৩) কিভাবে বন্টন করা হবে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে জাতীয় আয় বন্টন করা হবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় উৎপাদনের চারটি উপকরণের (জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন-এর) মধ্যে এটি বন্টন করা হবে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, উপাদানের পৃথক পৃথক উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে বন্টন করা হবে।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনীতিতে বন্টন বলতে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপকরণগুলোর মধ্যে জাতীয় আয়ের বন্টন বুঝায়।
- বন্টন অধ্যায়ে আমরা তিনটি প্রশ্নের উত্তর পাই, (১) কি বন্টন করা হবে, (২) কাদের মধ্যে বন্টন করা হবে এবং (৩) কিভাবে বন্টন করা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : চ. ১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। উৎপাদনের উপাদান কোনগুলো?
ক. জমি, শ্রম খ. পুঁজি, খাজনা
গ. সংগঠন, ব্যাংক ঘ. ব্যাংক, মজুরি
- ২। অর্থনীতিতে বন্টন বলতে কি বুঝায়?
ক. জাতীয় উৎপাদনকে উপকরণসমূহের মধ্যে ভাগ করা
খ. মোট জাতীয় আয়কে উপকরণসমূহের মধ্যে ভাগ করা
গ. মোট উৎপাদনকে জনগণের মধ্যে ভাগ করা
ঘ. মোট সম্পদকে জনগণের মধ্যে ভাগ করা
- ৩। ক্রিয়াগত আয় বন্টন কাকে বলে?
ক. জাতীয় আয় দেশের জনগণের মধ্যে বন্টন করা
খ. জাতীয় আয় উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে বন্টন করা
গ. জাতীয় উৎপাদন উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে ভাগ করা
ঘ. জাতীয় উৎপাদন সকলের মধ্যে ভাগ করা।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। অর্থনীতিতে বন্টন বলতে কি বুঝায় আলোচনা করুন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

- ১। ক্রিয়াগত আয় বন্টন কাকে বলে?

পাঠ ২ : বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- প্রান্তিক উৎপাদন কাকে বলে বলতে পারবেন।
- বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

আমরা পূর্বে দেখেছি যে উৎপাদন কার্যে বিভিন্ন উপাদান বা উপকরণ ব্যবহার করা হয়। মোট উৎপাদন এসব উপাদানের মধ্যে কিভাবে বন্টন বা ভাগ করা হয় এ সম্পর্কে একটি তত্ত্ব আছে। একে বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব বলে। এই তত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে, উৎপাদনের উপাদানের দাম বা পারিশ্রমিক তার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান।

প্রান্তিক উৎপাদন : কোন একটি উপকরণ (যেমন, শ্রম) এক একক বৃদ্ধি করে উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাই তার প্রান্তিক উৎপাদন। কোন উপকরণের দাম বা পারিশ্রমিক কত সেটা নির্ভর করে তার প্রান্তিক উৎপাদনের উপর। ধরা যাক, কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে। প্রতিটি দ্রব্য ৮ টাকা দামে বিক্রি করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির মোট আয় ৪০০ টাকা। এখন প্রতিষ্ঠানটি একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন ৩ একক বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩ একক হয়। মোট আয় হয় $৫৩ \times ৮ = ৪২৪$ টাকা। সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদন = $৪২৪ - ৪০০ = ২৪$ টাকা।

এখানে ১১ নং শ্রমিক প্রান্তিক শ্রমিক। ৩ একক বা ২৪ টাকা পরিমাণ মূল্যের উৎপাদন তার প্রান্তিক উৎপাদন। সুতরাং শ্রমিকের মজুরি ২৪ টাকার সমান হবে। কারণ তার প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য ২৪ টাকার সমান। মজুরি প্রান্তিক উৎপাদনের বেশি হবে না। তা হলে মালিক ক্ষতিগ্রহ-হবে। শ্রমের $q \uparrow Z \uparrow$ উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের (যেমন : জমি ও পুঁজির) দাম এদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, **প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী জাতীয় আয়কে বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে বন্টন করা হয়।**

মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র প্রান্তিক উৎপাদনের উপর ভিত্তি করেই কোন উপকরণের দাম বা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় না। যেমন- শ্রমিকের মজুরি প্রান্তিক উৎপাদন ছাড়াও তার যোগানের উপর নির্ভর করে। চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান কম হলে তার মজুরি প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি হবে। শ্রমিক সংঘও আন্দোলন বা মালিকের সাথে দরকষাকষির (আলাপ-আলোচনার) মাধ্যমে মজুরির হার বাড়াতে পারে। তাছাড়া সরকারও শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে, যা তার প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

- বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে কোন উপাদানের দাম বা পারিশ্রমিক তার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়।
- কোন একটি উপকরণ এক একক বাড়ালে উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাই তার প্রান্তিক উৎপাদন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে জাতীয় আয় বন্টন কি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়?
 - ক. উপকরণের মোট যোগান
 - খ. উপকরণের মোট চাহিদা
 - গ. উপকরণের মোট পরিমাণ
 - ঘ. উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদন

- ২। উৎপাদনের কোন একটি উপকরণ এক একক বৃদ্ধি করলে উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাকে কি বলে ?
- ক. ব্যক্তিগত আয়
খ. ব্যক্তিগত উৎপাদন
গ. প্রান্তিক উৎপাদন
ঘ. প্রান্তিক ক্ষমতা

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের বণ্টন ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। তাই এদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। পল্লী এলাকার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কর্মক্ষম লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে কৃষি খাতে। জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ এই কৃষি খাতের অবদান। শিল্পোন্নয়নেও এই খাতের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। দেশের জনগণের খাদ্যের সরবরাহ, তাদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতি কৃষির উন্নতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ দেশের অর্থনীতিতে কৃষির যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে কৃষি এবং কৃষক নানা সমস্যায় জর্জরিত। আমাদের ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। ফলে দেখা যায় আমাদের দেশের স্বল্প সংখ্যক লোক অধিকাংশ জমির মালিক। এরা কিন্তু জমি চাষের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। এরা সাধারণত শহরে বাস করে এবং বর্গাদারদের দিয়ে জমি চাষ করায়। ত্রুটিপূর্ণ ভূমি বণ্টন ব্যবস্থার কারণে আমাদের দেশে ১৯৬০ সালে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিল শতকরা ১২ ভাগ। বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগে।

বাংলাদেশের জমি খুবই উর্বর। কিন্তু আমাদের দেশে হেক্টর প্রতি ফলন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। আমাদের দেশের কৃষকরা প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষ করে। কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার প্রায় অনুপস্থিত। এছাড়া কৃষকরা এতই দরিদ্র যে তারা কৃষিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না। সরকারের কাছ থেকেও তারা সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ পায় না। অথচ তাদের উন্নত কৃষি উপকরণ, যেমন— বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ের প্রয়োজন। এগুলো ছাড়া প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ (যেমন— বন্যা, খরা, সীমিত ভূমি ব্যবহার প্রভৃতি কারণেও কৃষির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

দক্ষ জনগোষ্ঠী একটা দেশের সম্পদ। আমাদের দেশে প্রচুর শ্রমিক রয়েছে। কিন্তু এদের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ কোনটাই নেই। এছাড়া এদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বেশি (অর্থাৎ যাদের বয়স ১৪ এর নিচে এবং ৬৪ এর উপরে। এরা উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে না। কিন্তু এরা উৎপাদিত দ্রব্য ভোগ করে। আমাদের দেশের অধিকাংশ শ্রমিকের মজুরি খুবই কম। কারণ তাদের উৎপাদন ক্ষমতা কম। তাছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যাও বেশি। এরা অদক্ষ শ্রমিক। বাংলাদেশে শিল্পের উন্নতি হয়নি বললেই চলে। এদেশের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান শতকরা মাত্র ১১ ভাগ। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভাল শ্রম আইন নেই। শ্রমিকদের সংগঠনও খুব শক্তিশালী নয়। আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। মোট কর্মক্ষম শ্রমিকের শতকরা প্রায় ২২ ভাগ বেকার। স্বাভাবিক কারণেই জীবিকার তাগিদে তারা খুব কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করে। এসব কারণে বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি বা পারিশ্রমিক তাদের প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে অনেক কম। এখানে মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার ভূমিকা নগণ্য।

বাংলাদেশের মানুষ দরিদ্র। এ দেশের মানুষের আয় ও সঞ্চয় কম। তাই এদেশে পুঁজি গঠনের হার ও বিনিয়োগ কম। পুঁজির স্বল্পতা এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা। আমাদের দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রায় সম্পূর্ণভাবে

বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য আমাদের নিজস্ব সম্পদের অবদান নগণ্য। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য দেশের জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা, গবেষণা, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, খনিজ সম্পদ উত্তোলন প্রভৃতি কাজে প্রচুর পুঁজির প্রয়োজন। অথচ পুঁজির অভাবে এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। ধনী ব্যক্তির অসুৎপাদনশীল খাতে (যেমন— জমি ক্রয়, বাড়ি নির্মাণ, গাড়ি ক্রয় ইত্যাদি) বেশি অর্থ ব্যয় করে। এসব কারণে দেশে শিল্পের বিকাশ সম্ভাব্যজনক নয়।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও উদ্যোক্তা শ্রেণী সৃষ্টি হয়নি। এ দেশ বহু বছর বিদেশী শাসনের অধীন ছিল। তারা কখনও চায়নি এদেশে উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠুক। তাছাড়া এদেশে রয়েছে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার অভাব, ঝুঁকি গ্রহণে অনীহা ইত্যাদি। এসব কারণেও দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী তৈরি হচ্ছে না। এই শূন্যতা পূরণ করতে সরকারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশে কৃষি জমি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ফলে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের জমি খুবই উর্বর। কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ফলন কম হয়।
- দারিদ্র্যের কারণে কৃষকরা জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না।
- আমাদের দেশের শ্রমিকরা অদক্ষ, প্রয়োজনের তুলনায় এদের সংখ্যাও বেশি। তাই কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। ফলে তাদের পারিশ্রমিক তাদের প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে অনেক কম।
- বাংলাদেশের মানুষের আয় কম। ফলে সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন কম। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল।
- এছাড়া দক্ষ উদ্যোক্তার অভাবেও আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৮.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান শতকরা কত ভাগ?

ক. ৩৫	খ. ৩৮
গ. ৪০	ঘ. ৪২
- ২। কৃষিখাতে পল্লী এলাকার প্রায় শতকরা কত ভাগ কর্মক্ষম লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে?

ক. ৬৫ ভাগ	খ. ৭০ ভাগ
গ. ৭৫ ভাগ	ঘ. ৮০ ভাগ
- ৩। বর্তমানের বাংলাদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা শতকরা কত ভাগ?

ক. ১২ ভাগ	খ. ৩০ ভাগ
গ. ৪০ ভাগ	ঘ. ৫৬ ভাগ
- ৪। বাংলাদেশে জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান শতকরা কত ভাগ?

ক. ১০ ভাগ	খ. ১১ ভাগ
গ. ১৫ ভাগ	ঘ. ১৭ ভাগ
- ৫। আমাদের দেশের শ্রমিকের মজুরি কম হওয়ার কারণ কি?

ক. এদের দক্ষতা কম	খ. এদের চাহিদা বেশি
গ. মালিকেরা এদের ন্যায্য মজুরি দেয় না	ঘ. শ্রমিকেরা সংগঠিত নয় বলে

- ৬। বাংলাদেশের কর্মক্ষম শ্রমিকের শতকরা প্রায় কতভাগ বেকার?
ক. ৩০ ভাগ খ. ২২ ভাগ
গ. ৩৬ ভাগ ঘ. ৪০ ভাগ
- ৭। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা কি?
ক. পুঁজির স্বল্পতা খ. জনগণের কাজে অনীহা
গ. কুশলী শ্রমিকের অভাব ঘ. সম্পদের অসম বণ্টন

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বাংলাদেশের বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ৮.১ : ১। খ ; ২। খ ; ৩। খ।

অনুশীলনী ৮.২ : ১। ঘ ; ২। গ।

অনুশীলনী ৮.৩ : ১। ক ; ২। ঘ ; ৩। ঘ ; ৪। খ ; ৫। ক ; ৬। খ ; ৭। ক।

ইউনিট ৯

বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার সমাধান

ভূমিকা

বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় খুবই কম। মাত্র ২৮৩ আমেরিকান ডলার (এশিয়া উইক ৭ ফেব্রুয়ারি, '৯৮)। ১ ডলার প্রায় ৪৬ টাকার সমান। ফলে এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান বেশ নিচে। আমাদের দেশে অসংখ্য সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যাগুলো কি তা আমাদের জানা প্রয়োজন। সমস্যাগুলো শুধু চিহ্নিত করলেই চলবে না। এগুলো সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের অনগ্রসরতার জন্য যে সব সমস্যা দায়ী সেগুলোকে আমরা মৌলিক সমস্যা বলি। বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো হচ্ছে- কৃষির অনগ্রসরতা, বেকারত্ব, জনসংখ্যা সমস্যা, খাদ্য ঘাটতি, শিল্পের অনগ্রসরতা, মূলধনের অভাব, অনুন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, সম্পদের স্বল্পতা ইত্যাদি। এ সমস্যাগুলো সম্পর্কে সবার ধারণা থাকতে হবে। তবেই আমরা এর সমাধানের পথ খুঁজে পাব। আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলী এবং এদের সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১ : বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।
- দারিদ্র্যের দুষ্চক্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দীর্ঘদিন বিদেশীরা এই দেশটি শাসন করেছে। ফলে এদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তেমন উন্নতি লাভ করতে পারেনি। এখন বিদেশীদের শাসন নেই, কিন্তু আমাদের দেশে বেশ কিছু মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে যেগুলো আমাদের উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। এবার আসুন এসব মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করি। এগুলো নিম্নরূপ :

১। কৃষির অনগ্রসরতা : বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ দেশের শ্রম-শক্তির শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত আছে। দেশে যে উৎপাদন হয় তার প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ কৃষি হতে আসে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আমাদের কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত এবং হেক্টর প্রতি উৎপাদন কম। এর কারণ প্রাচীন চাষপদ্ধতি, কৃষি ঋণের অভাব, জলসেচের অভাব, বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থা ইত্যাদি।

২। শিল্পের অনগ্রসরতা : শিল্প ছাড়া শুধু কৃষির উপর নির্ভর করে দেশের অর্থনীতি উন্নত করা যায় না। তাই শিল্পখাতের উন্নয়ন প্রয়োজন। কিন্তু এ দেশের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান মাত্র শতকরা ১১ ভাগ। এর কারণ কি? কারণ মূলধনের অভাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির অভাব, সুষ্ঠু শিল্পনীতির অভাব, অনুন্নত পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা এবং দীর্ঘদিনের পরাধীনতা শিল্প বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে।

৩। খাদ্য ঘাটতি : খাদ্য ঘাটতি আমাদের একটি স্থায়ী সমস্যা। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে হয়। এতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার একটা বিরাট অংশ ব্যয় হয়। ফলে উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৪। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি : দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়। আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। তাই অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। মানুষের জীবনধারণও বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

৫। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি : একটি দেশের জনসংখ্যা দেশের সম্পদ। কিন্তু জনসংখ্যা জনশক্তিতে পরিণত না হলে তা সম্পদের পরিবর্তে সমস্যায় পরিণত হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সেই জনসংখ্যা ঠিকমত জনশক্তিতে পরিণত হচ্ছে না। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা প্রায় ১.৯ ভাগ। বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায়

১১১ মিলিয়ন (আদমশুমারি - ১৯৯১)। এ দেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৭৫৫ জন লোক বাস করে। এই বিপুল জনসংখ্যা আমাদের সীমিত সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে।

৬। দক্ষ শ্রমিকের অভাব : শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বেশি হলেও শ্রমিকদের নৈতিকতার মান ও দক্ষতা খুবই কম। ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে। কাজেই দক্ষ শ্রমিকের অভাবে আমাদের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

৭। বেকার সমস্যা : জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। ফলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার শতকরা প্রায় ২২ ভাগ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ১৯৯৫)। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বিরাজ করছে (অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক নিয়োজিত আছে)।

৮। দক্ষ উদ্যোক্তা বা সংগঠকের অভাব : কোন দেশের শিল্পের বিকাশ ঘটানোর জন্য দক্ষ উদ্যোক্তা বা সংগঠকের প্রয়োজন আছে। অথচ বাংলাদেশে দক্ষ সংগঠকের অভাব রয়েছে। ফলে এখানে শিল্পের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৯। অনুন্নত অবকাঠামো : কোন দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন উন্নত সামাজিক অবকাঠামো (যেমন— স্কুল, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি) এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামো (যেমন— যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেলপথ, বাঁধ, বিদ্যুৎশক্তি, বন্দর, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি)। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো অনুন্নত ও দুর্বল। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

১০। মূলধনের অভাব : আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। তাদের আয় ও সঞ্চয় কম। এদেশের সঞ্চয়ের হার মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ মাত্র। ফলে দেশে মূলধন গঠনের হার ও বিনিয়োগ কম।

১১। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অসুবিধা : বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান। গ্রামের উন্নতির উপর দেশের উন্নতি নির্ভরশীল। অথচ এখন পর্যন্ত এদেশে গ্রামভিত্তিক কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোরও সঠিক বাস্তবায়ন হয়নি। তবে বর্তমানে গ্রামীন ব্যাংক গ্রাম উন্নয়নের বাস্তবসম্মত কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১২। বৈদেশিক সাহায্যের অনুৎপাদনশীল ব্যবহার : আমাদের সম্পদ কম। তাই আমাদেরকে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। অথচ বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণের অধিকাংশই অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয় হয়। সঠিক নীতির অভাবে এর অপচয় হয়।

১৩। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি : বাংলাদেশ রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি করে। ফলে বিদেশের সাথে আমাদের দেনা-পাওনার ভারসাম্য প্রতিকূল থাকে।

১৪। সম্পদের স্বল্পতা : আমাদের দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ যতটুকু পাওয়া গেছে তারও যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে না। ফলে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। জাতীয় আয় এবং জনগণের মাথাপিছু আয়ও বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।

১৫। সম্পদের অসম বন্টন : আমাদের দেশে সম্পদের একটা বড় অংশ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত। এ কারণে অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান নিচু।

১৬। শিক্ষার অনগ্রসরতা : অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশে শতকরা প্রায় অর্ধেক লোক অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। বাকি প্রায় অর্ধেক লোক নিরক্ষর। ফলে জনগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণে অক্ষম।

১৭। দারিদ্র্যের দুষ্টিচক্র : আমাদের দেশে দারিদ্র্যের দুষ্টিচক্র বিরাজমান। এ কারণে আমাদের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। দারিদ্র্যের দুষ্টিচক্রের মূলকথা হচ্ছে — “একটি দেশের দারিদ্র্যের কারণ সে দরিদ্র।” অর্থাৎ দরিদ্র দেশের পশ্চাদপদতার কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য। **অনুন্নত দেশে উৎপাদন কম বলে লোকের আয় কম, আয় কম বলে সঞ্চয় কম, সঞ্চয় কম**

বলে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ কম। বিনিয়োগ কম বলে উৎপাদন কম। এভাবে দরিদ্র দেশগুলো দারিদ্র্যের দুষ্টিচক্রে আবদ্ধ।

এসব ছাড়াও ধর্মীয় গোড়ামি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অদক্ষ প্রশাসন, দুর্নীতি, অদৃষ্টবাদিতা প্রভৃতি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মারাত্মক বাধার সৃষ্টি করছে।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের কিছু মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে। এগুলো আমাদের উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করছে।
- বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো হচ্ছে— কৃষির অনগ্রসরতা, শিল্পের পশ্চাদপদতা, খাদ্যাঘাটতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, বেকার সমস্যা, দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব, অনুন্নত অবকাঠামো, মূলধনের অভাব, সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অসুবিধা, অনুৎপাদনশীল খাতে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবহার, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি, সম্পদের স্বল্পতা ও অসম বণ্টন, শিক্ষার অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্যের দুষ্টিচক্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : অনুশীলনী ৯.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

- ১। বাংলাদেশের জাতীয় উৎপাদনের শতকরা প্রায় কত ভাগ কৃষি হতে আসে?

ক. ৩৫ ভাগ	খ. ৪০ ভাগ
গ. ৪৫ ভাগ	ঘ. ৫০ ভাগ
- ২। এ দেশের শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় কত ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত?

ক. ৬০ ভাগ	খ. ৬৬ ভাগ
গ. ৭০ ভাগ	ঘ. ৭৫ ভাগ
- ৩। এ দেশের জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় কত ভাগ শিল্প হতে আসে?

ক. ৭ ভাগ	খ. ৮ ভাগ
গ. ১১ ভাগ	ঘ. ২০ ভাগ
- ৪। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ছিল?

ক. ১০০ মিলিয়ন	খ. ১১১ মিলিয়ন
গ. ১১২ মিলিয়ন	ঘ. ১১৫.৪ মিলিয়ন
- ৫। বৈদেশিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থা কি রকম?

ক. অনুকূল	খ. প্রতিকূল
গ. সুষম	ঘ. খুব অনুকূল
- ৬। কোনটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার অন্তর্গত?

ক. কৃষি শ্রমিক	খ. বেকারত্ব
গ. অনুকূল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য	ঘ. সম্পদের সুষম বণ্টন
- ৭। কোনটি সামাজিক অবকাঠামোর অন্তর্গত?

ক. রেলপথ	খ. জলসেচ ব্যবস্থা
গ. হাসপাতাল	ঘ. সমুদ্র বন্দর
- ৮। কোনটি অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অন্তর্গত?

ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	খ. দাতব্য চিকিৎসালয়
গ. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ঘ. বিদ্যুৎশক্তি

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। দারিদ্র্যের দুষ্টিচক্র বলতে কি বুঝায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।

Gm Gm m tclMg

পাঠ ২ : বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায়

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে অনেক মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে। সমস্যাসমূহের সমাধানের উপায়ও অবশ্যই থাকবে। তাহলে আসুন বাংলাদেশে বিদ্যমান মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করি। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। কৃষির উন্নয়ন : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য কৃষির উন্নয়ন অপরিহার্য। এর মাধ্যমে জনগণের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। কৃষির উন্নয়নের জন্য কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার বাড়াতে হবে। এছাড়া কৃষি ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য আমদানির জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয় তা দিয়ে শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করা সম্ভব হবে।

২। শিল্পোন্নয়ন : কৃষির পাশাপাশি শিল্পোন্নয়ন আবশ্যিক। বেকার সমস্যার সমাধান এবং আমাদের প্রচুর জনশক্তি ও দেশীয় কাঁচামালের সদ্যবহারের জন্য শিল্পোন্নয়ন প্রয়োজন। শিল্পের উন্নতি ছাড়া দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিল্পের উন্নয়নের জন্য একটি আধুনিক শিল্পনীতি প্রয়োজন। শুধু নীতি নির্ধারণ করলেই চলবে না। শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার জন্য বিবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে দক্ষ উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে।

৩। শিক্ষা বিস্তার : সাধারণ শিক্ষা, পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। এর ফলে উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

৪। মুদ্রাস্ফীতি রোধ : উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সঠিক রাজস্ব নীতি অনুসরণ করে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্ধিত হারে শিল্প স্থাপন করতে হবে। এর ফলে জনগণের খরচ কমবে, আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

৫। দক্ষ সংগঠক বা উদ্যোক্তা সৃষ্টি : শিল্পে ঝুঁকি বহন করতে পারে এমন সাহসী ও উদ্যোগী সংগঠক তৈরি করতে হবে। এজন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। এছাড়া বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি : কোন দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। সাধারণ শিক্ষা, পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান এবং উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের একটি প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে পারলে বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে এবং জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো যেতে পারে।

৮। বেকার সমস্যার সমাধান : বেকার সমস্যা দূর করতে হলে ব্যাপক হারে শিল্প-কারখানা স্থাপন করতে হবে। আমাদের দেশে শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। তাই যেসব শিল্পে অধিক হারে শ্রমিক নিয়োগ করা যায় সেসব শিল্প স্থাপন করতে হবে। এতে অধিকাংশ কর্মক্ষম লোক কাজের সুযোগ পাবে এবং বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

৯। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : অর্থনৈতিক উন্নতির পূর্বশর্ত উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। এর উপর দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি নির্ভর করে। তাই পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০। মূলধন বৃদ্ধি : কৃষি, শিল্প তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই মূলধনের সমস্যা দূর করতে হলে সঞ্চয়ের হার বাড়াতে হবে।

১১। সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন : বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতির জন্য গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া মৌসুমী বেকারত্ব দূর করার জন্য গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্প উন্নয়নের উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

১২। বৈদেশিক সাহায্যের যথাযথ ব্যবহার : প্রতি বছর আমরা প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য পেয়ে থাকি। এগুলোর যাতে অপচয় না হয় এবং সঠিক ব্যবহার হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। তবেই দেশের উন্নতি সম্ভব।

১৩। আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস : আমাদের আমদানি বেশি, রপ্তানি কম। উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বাড়াতে হবে। তাহলে আমরা বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারব। এর সাহায্যে আমরা বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করে শিল্পের দ্রুত উন্নতি করতে পারব।

১৪। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার : বাংলাদেশে যেসব প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে (যেমন— গ্যাস, কয়লা, তেল, চূনাপাথর, কঠিন শিলা ইত্যাদি) তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে আমাদের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে এবং জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে।

১৫। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র : দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র দূর করতে হবে। এর জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া প্রশাসন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি, দীর্ঘসূত্রিতা দূর, দুর্নীতি দমন ও কুসংস্কার দূর করতে হবে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে আমাদের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যথা— কৃষির উন্নয়ন, খাদ্য সমস্যার সমাধান, শিল্পের উন্নয়ন, শিক্ষা বিস্তার, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, দক্ষ সংগঠক সৃষ্টি; দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ, বেকার সমস্যার সমাধান, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, মূলধন বৃদ্ধি, সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন, বৈদেশিক সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবহার, আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র দূর, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি দমন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.২

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- কোনটি বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য সমস্যা সমাধান করা যায়?
ক. খাদ্য আমদানি করে খ. রপ্তানি বৃদ্ধি করে গ. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে ঘ. শিল্প স্থাপন করে
- কোনটি বৃদ্ধি করে মূলধনের সমস্যা সমাধান করা যায়?
ক. সঞ্চয় খ. বিদেশী ঋণ গ. আয় ঘ. বিনিয়োগ
- আমাদের দেশে কোন ধরনের শিল্প স্থাপন করতে হবে?
ক. যে শিল্পে বেশি মূলধন প্রয়োজন খ. যে শিল্পে অধিক হারে শ্রমিক নিয়োগ করা যায়
গ. যে শিল্পের কাঁচামাল বিদেশ হতে আমদানি করতে হয় ঘ. যে শিল্পে বিলাসদ্রব্য উৎপাদন করে

রচনামূলক প্রশ্ন

- বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানের পথ নির্দেশ করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ৯.১ : ১। ক ; ২। খ ; ৩। গ ; ৪। খ ; ৫। খ ; ৬। খ ; ৭। গ ; ৮। ঘ।

অনুশীলনী ৯.২ : ১। গ ; ২। ক ; ৩। খ ;

ইউনিট ১০

অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

ভূমিকা

অর্থ আমাদের প্রায় প্রতিটি কার্যকে প্রভাবিত করে। তাই আমাদের সকলেরই অর্থ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ব্যাংক আবার এই অর্থ নিয়ে ব্যবসা করে। আপনার মনে প্রশ্ন হতে পারে অর্থ নিয়ে ব্যবসা, সেটি কি করে সম্ভব? হ্যাঁ, তাও সম্ভব। এই ইউনিট পাঠের পর আপনি অর্থ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংক সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ ১ : অর্থের প্রচলন

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- দ্রব্য বিনিময় কাকে বলে বলতে পারবেন।
- দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্থের আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

দ্রব্য বিনিময় : দ্রব্য বিনিময় একটি লেনদেনের পদ্ধতি। প্রাচীনকালে যখন অর্থ বা মুদ্রা ছিল না তখন এই পদ্ধতিতেই মানুষ চাহিদার জিনিসটি পেত। ধরুন, আপনি চাল দিয়ে জেলের কাছ থেকে মাছ নিলেন। এক্ষেত্রে আপনি যে পদ্ধতিতে কাজটি করলেন সেটি দ্রব্য বিনিময়। দ্রব্য-বিনিময় প্রথার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্ত তিনটি নিচে দেওয়া হল :

ক. একজনের পণ্য অন্যজনের পাওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে।

খ. যে দ্রব্যটি পাওয়ার ইচ্ছা তা বিনিময় করার জন্য নিজের পণ্যটি প্রদানের অনুরূপ ইচ্ছা থাকতে হবে।

গ. যে দ্রব্যটি পাওয়ার ইচ্ছা তার উপযোগ অবশ্যই বিনিময়ে যে পণ্যটি প্রদান করা হবে তার উপযোগ থেকে বেশি থাকতে হবে।

দ্রব্য-বিনিময় প্রথায় উপরিউক্ত শর্ত পূরণ করে লেনদেন করা গেলেও পরবর্তীকালে এতে প্রচুর অসুবিধা দেখা দিল।

দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা : নিচে দ্রব্য-বিনিময় প্রথার বিবিধ অসুবিধা বর্ণনা করা হল :

১. অভাবের অসামঞ্জস্যতা : ধরা যাক, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় আপনার একজোড়া হালের গরু প্রয়োজন। এখানে আপনার যে অভাব তা হল, একজোড়া হালের গরু। হালের গরুর বিনিময়ে আপনার পিতার লাগানো উঠানের আম গাছটি প্রদান করতে আপনি রাজি হলেন। কিন্তু গাছের বিনিময়ে একজোড়া হালের গরু কোথাও পেলেন না। কারণ যার গরু আছে তার হয়ত গাছের অভাব নেই। এভাবে দ্রব্য-বিনিময় প্রথায় দাতা-গ্রহীতার মধ্যে অভাবের একটি অসামঞ্জস্য বিরাজ করে। যেমন— একজন চালের বদলে কাপড় চান। কিন্তু যার কাপড় আছে তিনি হয়ত চাল চান না, তিনি মাছ চান।

২. পণ্যের অবিভাজ্যতা : ধরা যাক, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় আপনার একসাথে চাল, মাছ, তেল, কাপড় এসব দরকার। কিন্তু দেওয়ার মত আপনার কাছে মাত্র একটি গরু আছে। এক্ষেত্রে গরুটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যের সাথে বিনিময় করা সম্ভব নয়। সুতরাং পণ্যের অবিভাজ্যতা দ্রব্য-বিনিময় প্রথার একটি বিশেষ অসুবিধা।

৩. মূল্যমানের অভাব : ধরুন, একটি শার্টের দাম ১০০ টাকা এবং একটি বলপেনের দাম ৫ টাকা। সুতরাং সহজেই ২০টি বলপেন একটি শার্টের সাথে বিনিময় করা যায়। এখানে মূল্য নিরূপণের জন্য টাকাকে একক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বিনিময় হার নির্ধারণেও সুবিধা হয়েছে। কিন্তু অর্থের প্রচলন না থাকলে একটি শার্টের জন্য একজন হয়ত ২০টি বলপেন এবং অপর একজন হয়ত ৩০টি বলপেন দিতে রাজি হবে। সুতরাং আমরা এখান থেকে বলতে পারি, দ্রব্য-বিনিময় প্রথায় নির্দিষ্ট মূল্যমানের অভাব রয়েছে।

৪. সঞ্চয়ের অভাব : দ্রব্য সঞ্চয় করলে তা প্রায় ক্ষেত্রেই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই দ্রব্য সঞ্চয় নিরাপদ নয়। এছাড়া দ্রব্য সঞ্চয়ে পর্যাপ্ত জায়গার প্রয়োজন। ফলে দ্রব্য-বিনিময় প্রথায় মানুষ সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

অর্থের বিবর্তন

মানুষ তাঁর নিজের প্রয়োজনে অর্থ আবিষ্কার করেছে। অর্থের এই আবিষ্কারের মূলে রয়েছে এক বিবর্তনের ইতিহাস। এই বিবর্তনের ইতিহাসটি সৃষ্টি হয়েছে কয়েক হাজার বছর ধরে ধাপে ধাপে। তাহলে আসুন এই ইতিহাসটি কি সে সম্পর্কে জেনে নিই।

১। দ্রব্য বিনিময় : প্রাচীনকালে মানুষ গাছে ও পাহাড়-পর্বতের গুহায় বাস করত। ফলমূল ও পশু-পাখির কাঁচা মাংস ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। পরে জীবনের প্রয়োজনে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে। ধীরে ধীরে মানুষ আঙনের ব্যবহার ও কৃষি কাজ শিখে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান ও চাহিদার পরিবর্তন হতে থাকে। এই বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্যই প্রচলন হয় দ্রব্য-বিনিময় প্রথা। মানুষ স্থায়ী অভাব পূরণের জন্য একজনের দ্রব্য অন্যজনের দ্রব্যের সাথে বিনিময়ের প্রথা প্রচলন করে। পরে এর নানা অসুবিধার কারণে আবিষ্কৃত হয় সামগ্রী বা দ্রব্য-মূল্য।

২। সামগ্রী বা দ্রব্যমূল্য : দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য মানুষ ছাগল, গরু, চামড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি একে একে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু এই সকল দ্রব্যের মাধ্যমে মানুষ সঞ্চয় করতে পারত না। ফলশ্রুতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মূল্যবান ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়।

৩। মূল্যবান ধাতু : এ যুগে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখে। মানুষের মাঝে তামা, রূপা, ও সোনার কদর বৃদ্ধি পায়। সকলেই এসব ধাতুকে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে স্বীকার করে। ফলে ধীরে ধীরে বিনিময়ের মাধ্যম পরিবর্তিত হয়ে যায়। শুরু হয় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় মূল্যবান ধাতুর ব্যবহার। ব্যবহৃত ধাতুগুলো ছিল পিভাকৃতির। ফলে এর গুণাগুণ অর্থাৎ আসল-নকল বিচারের প্রশ্ন প্রায়ই উঠত। সুতরাং মূল্যবান ধাতুর ব্যবহারেও অসুবিধা দেখা দিল।

৪। ধাতব দ্রব্য : পিভাকারে ধাতুর ব্যবহারের অসুবিধা দূর করার জন্য ধাতুকে মুদ্রার আকার দিয়ে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। কিন্তু এতেও অসুবিধা দেখা দিল। যেমন— মুদ্রা জাল হওয়া, মুদ্রার ধাতু চুরি হওয়া ইত্যাদি। এই অসুবিধা দূর করারও ব্যবস্থা হয়েছিল সে সময়ে। যেমন—মুদ্রা জাল রোধ করার জন্য মুদ্রায় রাজা-বাদশাহদের নাম ও নানা প্রকারের মোহর অঙ্কিত করা হত। মুদ্রার ধাতু চুরি রোধ করার জন্য মুদ্রার কিনারায় খাঁজ কাটা হত। যেমন— আমাদের দেশের পঁচিশ পয়সা, পঞ্চাশ পয়সা এবং এক টাকা ও পাঁচ টাকার মুদ্রা।

৫। কাগজি মুদ্রা : মূল্যবান ধাতু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। ধাতুর অপ্রতুলতা ও বহনে অসুবিধা দেখা দিলে এই অসুবিধা দূর করার জন্য কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। কাগজি মুদ্রার প্রতুলতা বেশি এবং কাগজকে সহজে মুদ্রাঙ্কন করে মুদ্রায় পরিণত করা যায়। সুতরাং বর্তমানে কাগজি মুদ্রার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। কাগজি মুদ্রা প্রচলন করতে হলে সরকারকে নির্দিষ্ট মূল্যের স্বর্ণ মজুদ রাখতে হয়।

৬। ঋণপত্র : বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণপত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। দ্রব্য-বিনিময় প্রথা কি?
 - ক. টাকা দিয়ে দ্রব্য ক্রয়
 - খ. অন্যের দ্রব্য লাভ করা
 - গ. নিজের দ্রব্যের পরিবর্তে অন্যের দ্রব্য লাভ
 - ঘ. সোনা-রূপার বিনিময়ে অন্যের দ্রব্য লাভ

- ২। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার সুবিধা কোনটি?
ক. পণ্যের অবিভাজ্যতা খ. মূল্যমানের অভাব
গ. অভাবের অসামঞ্জস্যতা ঘ. চাহিদা পূরণ
- ৩। কোনটি অর্থের বিবর্তনের ধাপ হিসেবে পরিচিত?
ক. সরকারি মুদ্রা খ. কাগজী মুদ্রা
গ. ব্যাংক মুদ্রা ঘ. প্রায় মুদ্রা

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। দ্রব্য বিনিময় প্রথা কি? এর অসুবিধাগুলো কি ছিল?
২। অর্থের বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলতে কি বুঝায়?

পাঠ ২ : অর্থের সংজ্ঞা ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য :

- এ পাঠ শেষে আপনি—
- অর্থের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- অর্থের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

অর্থের সংজ্ঞা

‘অর্থ’ শব্দটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। ধরুন, আপনি ৫ টাকা দিয়ে একটি বলপেন ক্রয় করলেন। এখানে আপনার কলমটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে টাকার মাধ্যমে। আবার ধরুন, ১০০ টাকা দিয়ে আপনি আপনার বন্ধুর ঋণ বা ধার শোধ করলেন। আবার টাকা আপনি সঞ্চয়ও করতে পারেন। আপনার প্রত্যেকটি কাজের সাথে টাকা জড়িত। এখানে টাকাকেই আমরা অর্থ বলি। উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, **যে জিনিসের মাধ্যমে মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করে, ধার-দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে সবাই গ্রহণ করে এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে ব্যবহার করে তাকে অর্থ বলে। অর্থ মূলত বিনিময়ের মাধ্যম।**

অর্থের কার্যাবলী

বর্তমানে অর্থ অনেকগুলো কার্য সম্পাদন করে। নিচে এই কার্যগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল :

১. বিনিময়ের মাধ্যম : আপনি পূর্বের দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলো জেনেছেন। অর্থের আবিষ্কার দ্রব্য বিনিময় প্রথার সব সমস্যা দূর করেছে। সব ধরনের পণ্য বা সেবা অর্থের বিনিময়ে লেনদেন হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি অর্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

২. মূল্য নিরূপণ : ধরুন, বাজার থেকে এক মিটার কাপড় কিনবেন। এর জন্য আপনাকে মূল্য দিতে হবে। এই মূল্য কিভাবে দিবেন? মূল্যটি অবশ্যই টাকার মাধ্যমে দিবেন। তাহলে টাকা এখানে কি কাজ করেছে? নিশ্চয়ই মূল্য নিরূপণ করেছে। মিটার দৈর্ঘ্যের একক এবং টাকা মূল্যের একক। কারণ মিটার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে এবং টাকা মূল্য পরিমাপ করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি টাকা মূল্য বা হিসাবের একক হিসেবে কাজ করে।

৩. সঞ্চয়ের বাহন : একজন কৃষকের কথাই ধরুন। তিনি তাঁর উৎপাদিত ফসল বছরের পর বছর জমিয়ে রাখতে পারেন না। এর মূল কারণ হল ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া ফসল জমিয়ে রাখার জন্য প্রচুর জায়গা প্রয়োজন হয়। কিন্তু তিনি যদি ফসল বিক্রয় করে প্রাপ্ত টাকা সঞ্চয় করে রাখেন, তাহলে এই দু’টি অসুবিধা দূর হতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।

৪. স্থগিত লেনদেনের মাধ্যম : ধরুন, কোন বন্ধুর কাছে আপনি ৫০০ টাকা ঋণী আছেন। এই ঋণের টাকা পাঁচ বছর পরে পরিশোধ করতে হবে। অর্থের মাধ্যমে এভাবে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা খুব সুবিধাজনক। সময় পরিবর্তনের দরুন অর্থের মূল্যেরও পরিবর্তন হয়। যেমন— ঋণ পরিশোধের সময় আপনার বন্ধু ৫০০ টাকা নিতে রাজি নাও হতে পারেন। কারণ পাঁচ বছর আগের ও পাঁচ বছর পরের ৫০০ টাকার মূল্য পরস্পর সমান নয়। তাই তিনি হয়ত অতিরিক্ত টাকা দাবী করতে পারেন এবং দাবী করাটাই স্বাভাবিক। অর্থের মাধ্যমে সহজেই এই সমস্যাটির সমাধান করা যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি অর্থ স্থগিত লেনদেনের মাধ্যম।

৫) নগদ অর্থের কাজ : নগদ অর্থের কাজ সম্পর্কে আমরা সকলেই পরিচিত। যেমন— ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার জন্য নগদ টাকা প্রয়োজন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য নগদ টাকা প্রয়োজন ইত্যাদি। দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য নগদ অর্থের মত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ আর নেই। স্থায়ী সম্পত্তি, যথা— ঘর-বাড়ি, জমি-জমা এগুলোর বিনিময়ে মানুষ দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটাতে পারে না। যেমন— একজন ধনী লোকের জরুরি চিকিৎসার জন্য একটি ক্লিনিকে যাওয়া প্রয়োজন। এই অবস্থায় তাঁর বাড়ি-গাড়ির চেয়ে নগদ টাকার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

অর্থ সরবরাহের নিয়ামকসমূহ

নিচে অর্থ সরবরাহের নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. বিহিত মুদ্রা : একটি ৫ টাকার নোটের উপরের লেখাগুলো পড়ুন। ‘---- চাহিবামাত্র ইহার বাহককে পাঁচ টাকা দিতে বাধ্য থাকিবো’ অন্যান্য লেখার সাথে এই লেখাটি দেখতে পাবেন। লেখাটির কারণ হল, এই মুদ্রা লেনদেনের নিষ্পত্তিতে কেউ গ্রহণ করতে রাজি না হলে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তিনি দণ্ডনীয় অপরাধ করবেন। এই ধরনের মুদ্রাকে বিহিত মুদ্রা বলা হয়। বিহিত মুদ্রা সরকারি ঘোষণা ও আইনের আওতায় প্রচলিত। বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ টাকা থেকে পাঁচশত টাকার নোট বিহিত মুদ্রা হিসেবে প্রচলন করে। তাই এই মুদ্রাগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে।

২. ব্যাংক মুদ্রা : ধরুন, ১০০০ টাকার ঋণ পরিশোধ করবেন। পাওনাদারকে নগদ ১০০০ টাকা না দিয়ে ১০০০ টাকার একটি চেক প্রদান করলেন। পরে পাওনাদার আপনার ব্যাংক থেকে এই টাকা তুলে নিবেন। এখানে চেকটি লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করল। সুতরাং চেকটিকে আমরা অর্থ বলব। এটি মূলত টাকার বিকল্প। চেকের মত বিল অব একচেঞ্জ, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি দলিলগুলোকে ব্যাংক মুদ্রা বলা হয়।

৩. সরকারি মুদ্রা : এক টাকা ও দুই টাকার নোট পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবেন এই দুটি নোটের মধ্যে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর রয়েছে। কারণ বাংলাদেশ সরকার এই মুদ্রা প্রচলন করে। এক টাকা, দুই টাকার মত পয়সাগুলোও সরকার প্রচলন করে। সরকার এই মুদ্রা প্রচলন করে বিষয় এই মুদ্রাকে সরকারি মুদ্রা বলা হয়।

৪. প্রায়-মুদ্রা : ধরুন, আপনার কাছে ১০০০ টাকার প্রাইজবন্ড আছে। প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে এই প্রাইজবন্ড সহজেই ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকায় পরিণত করতে পারবেন। এই প্রাইজবন্ডের মাধ্যমে আপনি ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন। তবে ঋণদাতা যদি এটি গ্রহণ করতে রাজি না হন, তাহলে তিনি আইনত দণ্ডনীয় হবেন না। কারণ সরকারি আইন অনুসারে লেনদেনের নিষ্পত্তিতে এটি গ্রহণ করতে কেউ বাধ্য নয়। প্রাইজবন্ডের একটি বৈশিষ্ট্য হল, একে সহজেই নগদ অর্থে পরিণত করা যায়। প্রাইজবন্ডের মত সরকারি বন্ড, স্থায়ী আমানত ইত্যাদি যে সকল সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে নগদ অর্থে পরিণত করা যায় তাকে প্রায়-মুদ্রা বলা হয়।

সারসংক্ষেপ

- অর্থের প্রধান কার্যাবলী হচ্ছে— বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্য নিরূপণ, সঞ্চয়ের বাহন ও স্থগিত লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা।
- অর্থ সরবরাহের নিয়ামকসমূহ হচ্ছে- বিহিত মুদ্রা, সরকারি মুদ্রা, ব্যাংক মুদ্রা ও প্রায়-মুদ্রা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। অর্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হয় কি হিসেবে?

ক. সঞ্চয়ের বাহন	খ. মূল্য নিরূপণ
গ. বিনিময়ের মাধ্যম	ঘ. স্থগিত লেনদেনের মাধ্যম
- ২। কোনটি বিহিত মুদ্রা?

ক. পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা	খ. এক টাকার নোট
গ. দুই টাকার নোট	ঘ. দশ টাকার নোট
- ৩। কোনটি সরকারি মুদ্রা?

ক. এক টাকার নোট	খ. দশ টাকার নোট
গ. বিশ টাকার নোট	ঘ. পঞ্চাশ টাকার নোট

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। অর্থের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
- ২। অর্থের সংজ্ঞা লিখুন। অর্থ সরবরাহের নিয়ামকসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ ৩ : ব্যাংক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য :

- এ পাঠ শেষে আপনি—
- ব্যাংক কি তা বলতে পারবেন।
- ব্যাংক উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাংকের প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ব্যাংকের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যাংক কি?

ব্যাংক কথাটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অর্থ নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। কারণ ব্যাংক অর্থের ব্যবসা করে। প্রতিদিন অগণিত মানুষ ব্যাংকে তাদের সঞ্চয় জমা রাখে। এর মূল কারণ হল, সঞ্চয়ের অর্থ নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয়। এছাড়া ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে নির্ধারিত হারে সুদ পাওয়া যায়। প্রয়োজনের সময় এই অর্থ আবার উত্তোলন করা যায়। কিন্তু একটি মজার ব্যাপার হল সকলেই একযোগে এই অর্থ উত্তোলন করতে আসে না। তাই ব্যাংকের কাছে সকলের সঞ্চিত অর্থের বিরাট অংশ থেকে যায়। এই অংশ থেকে ব্যাংক আবার অন্য একজনকে ঋণ দেয়। অর্থাৎ ব্যাংক এক পক্ষের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে এবং অন্য পক্ষকে ঋণ দেয়। যে পক্ষ টাকা জমা রাখে তাকে সুদ প্রদান করে এবং যে পক্ষকে ঋণ দেয় তাঁর কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ গ্রহণ করে। এই বেশি সুদ ব্যাংকের মুনাফা। তাহলে দেখা যায় যে, ব্যাংক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কার্যসম্পাদন করে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে একদিকে জনগণের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ গ্রহণ এবং অন্যদিকে ঋণদান সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে মুনাফা অর্জন করে তাকে ব্যাংক বলে।

ব্যাংক উৎপত্তির ইতিহাস

বর্তমানে আমরা সকলেই ব্যাংকের সাথে পরিচিত। ব্যাংকের উৎপত্তির পেছনে একটি ইতিহাস রয়েছে। আপনার নিশ্চয়ই এই ইতিহাস সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করবে। তাহলে আসুন ইতিহাসটি জেনে নিন।

ব্যাংক আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ইংল্যান্ডে স্বর্ণকারগণ বিশাসী, সৎ ও নিষ্ঠাপরায়ন লোক হিসেবে বিবেচিত হত। তাদের যেহেতু মূল্যবান জিনিসের ব্যবসা ছিল তাই তারা জিনিসগুলোর পর্যাপ্ত নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করত। এ কারণে জনগণ তাঁদের সঞ্চয় স্বর্ণকারদের কাছে গচ্ছিত রাখত।

কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর স্বর্ণকারগণ দেখতে পেল, এ ধরনের সকল আমানতকারী একসঙ্গে তাদের জমাকৃত টাকা উঠায় না বা সবাই একযোগে টাকা উঠাতে আসে না। এভাবে জমাকৃত টাকার এক বিরাট অংশ তাদের কাছে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে।

এই অবস্থা দেখে স্বর্ণকারগণ আমানতকারীদের দাবি মেটানোর জন্য একটি অংশ হাতে রেখে গোপনে বাকী অংশ অন্য এক পক্ষকে ধার দিতে শুরু করল। এ ধরনের ধার গ্রহণকারীর কাছ থেকে তারা সুদ আদায় করা শুরু করল। কিন্তু পরে গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে গেল। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সকল আমানতকারী একযোগে অর্থ উঠাতে চলে আসে। এই অবস্থায় তারা সকলের দাবি পূরণ করতে না পেরে দোকান বন্ধ করে পেছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করে। যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাকে দেউলিয়া বলা হয়। ইংরেজিতে দেউলিয়া শব্দটির অর্থ **Bankrupt**। তাই তখন স্বর্ণকারদের দেউলিয়া বা **Bankrupt** বলা হত। স্বর্ণকারগণ আমানতকারীদের বিশাস ভঙ্গ করলেও তাঁদের কাজটি জম্ম দিয়েছে আজকের এই ব্যাংক ব্যবস্থার। বর্তমানে ব্যাংক ব্যবস্থা ছাড়া কোন দেশের অর্থনীতির কথা কল্পনাও করা যায় না।

ব্যাংকের প্রকারভেদ

কাজের ধরন অনুযায়ী ব্যাংককে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন—

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

- খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং
গ. উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক

যে ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকের কার্যাবলী ও দেশের সামগ্রিক মুদ্রা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। একটি দেশে মাত্র একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক। ঢাকার মতিঝিলে এই ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। দেশে সব ধরনের ব্যাংক এই ব্যাংকের আওতায় থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

নিচে কয়েকটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম দেওয়া হল :

দেশ	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম
ব্রিটেন	ব্যাংক অব ইংল্যান্ড,
যুক্তরাষ্ট্র	ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম,
ভারত	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া,
ফ্রান্স	ব্যাংক অব ফ্রান্স।

২। বাণিজ্যিক ব্যাংক

আপনি নিজে যে ব্যাংকটির সাথে পরিচিত সেটি হল বাণিজ্যিক ব্যাংক। এই ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংক নামকরণের মূল কারণ হল এর উদ্দেশ্য মূলত বাণিজ্যিক অর্থাৎ মুনাফা অর্জন করা। যে ব্যাংক সমাজের এক পক্ষের অর্থ সুদের বিনিময়ে অন্য পক্ষকে ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়। নিচে আমাদের দেশে পরিচালিত কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নাম দেওয়া হল :

সোনালী ব্যাংক ;
অগ্রণী ব্যাংক এবং
জনতা ব্যাংক।

বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক :

এইচএসবিসি এবং গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক।

৩। উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান

যে ব্যাংক দেশের কোন বিশেষ খাত উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলে। মুনাফা অর্জন করা এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং উন্নয়নমূলক কাজ করাই এর মূল উদ্দেশ্য। কৃষি ব্যাংকের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। এই ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হল কৃষিখাত উন্নত করা। দেশের বাণিজ্য খাত উন্নত করা এর মূল উদ্দেশ্য নয়। নিচে বাংলাদেশের কয়েকটি উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হল :

উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক
গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
সমবায় ব্যাংক

উন্নয়ন খাত

শিল্প
গৃহনির্মাণ
কৃষি
কৃষি ও সমবায়ীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা।

সারসংক্ষেপ

- ব্যাংক একপক্ষের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করে এবং অপরপক্ষকে ঋণ দেয়। তিন ধরনের ব্যাংক আছে : কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

পাঠ ৪ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকও অন্যান্য ব্যাংকের মত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটি সমস্ত ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। কেন্দ্রীয় ব্যাংক রক্ষণীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য সম্পাদন করে। এই ব্যাংকটি জাতীয় স্বার্থে কাজ করে— মুনাফা অর্জন করা এর মূল উদ্দেশ্য নয়। এই ব্যাংক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। নিচে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করা হল :

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

১. নোট ইস্যু সংক্রান্ত : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে প্রচলিত বিহিত মুদ্রা প্রচলন করে। যেমন— বাংলাদেশ ব্যাংক ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট ইস্যু বা প্রচলন করে। তাই এসব নোটের গায়ে ব্যাংকের প্রধান অর্থাৎ গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে। একটি কথা মনে রাখবেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ইচ্ছে করলেই যে কোন পরিমাণ নোট ইস্যু করতে পারে না। কারণ নোট ইস্যু করার জন্য এই ব্যাংকটিকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা (ডলার বা পাউন্ড) রিজার্ভ হিসেবে জমা রাখতে হয়। আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিল (International Monetary Fund বা IMF) এই রিজার্ভের হার নির্ধারণ করে দেয়।

২. সরকারের ব্যাংক : সরকারেরও কিন্তু আয়-ব্যয় দুটোই আছে। কর আদায়ের মাধ্যমে সরকার আয় করে এবং সরকারি সংস্থার কর্মচারীদের বেতন প্রদান ও উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করে। এই আয়-ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সরকারকে একটি ব্যাংকের সাহায্য নিতে হয়। সরকারের এই ব্যাংকটি মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সরকার আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ এই ব্যাংকে জমা রাখে। আবার সংকটের সময় এই ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের জন্য উপরিউক্ত কার্য সম্পাদন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে আর্থিক বিষয়ে নানাবিধ পরামর্শ প্রদান করে।

৩. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক : দেশের অন্যান্য ব্যাংক ইচ্ছামত কার্য সম্পাদন করতে পারে না। ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করে কার্য সম্পাদন করতে হয়। কোন ব্যাংক এই নীতিমালার বাইরে কার্য সম্পাদন করলে বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারে। ব্যাংকগুলো বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের আমানতের একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখে এবং সংকটের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে।

৪. সর্বশেষ ঋণদাতা : পূর্বেই বলেছি বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ গ্রহণ করে। জনগণের উত্তোলন চাহিদা পূরণ করার জন্য একটি অংশ নিজের কাছে রাখে এবং অপর অংশ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। জনগণের উত্তোলন চাহিদা বেড়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকটি সামাল দেওয়ার জন্য আবার অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিবে। ধরুন, সোনালী ব্যাংকের কাছে মাস শেষে আমানতকারীদের উত্তোলন চাহিদা পূরণ করার জন্য পর্যাপ্ত নগদ টাকা নেই। এই অবস্থায় ব্যাংকটি কি করবে? নিশ্চয়ই আমানতকারীদের ফিরিয়ে দিবে না। কারণ এতে আমানতকারীদের মনে ব্যাংকটির আর্থিক স্বচ্ছলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। সংকট নিরসনের জন্য সোনালী ব্যাংক অন্য যে কোন ব্যাংক, যেমন— অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ইত্যাদি ব্যাংকের কাছে ঋণ চাইবে। এই ব্যাংকগুলো ঋণ দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তখন কি করবে? কোথায় যাবে? এবার যাবে তার নিজের ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে ফিরিয়ে দিবে না। অবশ্যই প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করবে। সুতরাং আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ দানে শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ্য করতে পারি।

৫. **বিনিময় হার ঠিক করা** : ধরুন, আপনার হাতের ঘড়িটি জাপানি। এই ঘড়িটি জাপান থেকে এমনি আসেনি। এটিকে ক্রয় করতে হয়েছে। বিদেশের সাথে বাংলাদেশের এই ক্রয়-বিক্রয়কে বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়। এরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে আমাদের দেশের পণ্য বিদেশে বিক্রয় হচ্ছে এবং বিদেশী বহু পণ্য আমাদের দেশে আসছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক বিনিময় হার ঠিক রাখা একান্ত প্রয়োজন। বৈদেশিক বিনিময় আর কিছুই নয়, এটি মূলত একটি দেশের মুদ্রার সাথে অন্য একটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার। খবরের কাগজে বা রেডিও-টিভিতে শুনে থাকবেন যে, টাকার সাথে ডলারের একটি বিনিময় হার আছে। যেমন, ১ ডলার = ৪৫ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক শুধু ডলারের সাথে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব মুদ্রার সাথে টাকার একটি বিনিময় হার রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই হার স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ।

৬. **ক্রিয়ারিং হাউজ বা নিকাশ ঘর** : চেকের মাধ্যমে আপনি আপনার ধার-দেনা শোধ করতে পারেন। ধরুন, আপনার বন্ধুকে ধার শোধ বাবদ ১০০ টাকার একটি চেক প্রদান করলেন। আপনার হিসাব সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় এবং আপনার বন্ধুর হিসাব জনতা ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখায়। আপনার বন্ধু চেকটি জনতা ব্যাংকে তাঁর নিজের হিসাবে জমা করবে। অতঃপর জনতা ব্যাংক এই চেকের অর্থ সোনালী ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করবে। মনে রাখবেন এ ধরনের সংগ্রহের জন্য জনতা ব্যাংকের কোন কর্মীকে সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় আসতে হবে না। চেকটির অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ হয়ে আপনার বন্ধুর হিসাবে জনতা ব্যাংকের ঐ শাখায় জমা হবে। এই প্রক্রিয়াকে ক্রিয়ারিং হাউজ বা নিকাশ ঘর বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এ ধরনের আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্পন্ন করা হয়।

৭. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ** : পূর্বের আলোচনায় জেনেছেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়; একে মুদ্রাস্ফীতি বলে। আবার অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে কম হলে জিনিসপত্রের দাম কমে যায়; একে মুদ্রা সংকোচন বলে। দুটি অবস্থাই অসুবিধাজনক। এ কারণে ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। এই ঋণ নিয়ন্ত্রণের কাজটি কেন্দ্রীয় ব্যাংককেই করতে হয়।

৮. **ন্নয়নমূলক কার্যকলাপ** : সরকার উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য প্রয়োজন হতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ সংক্রান্ত ব্যাপারে সহায়তা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

ক. অর্থ জমা রাখা : বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হচ্ছে বিভিন্ন লোকের অর্থ জমা রাখা। তিন ধরনের হিসাবের মাধ্যমে এই অর্থ জমা রাখা হয়। এগুলো হচ্ছে : (১) **চলতি হিসাব**— জমাদানকারীগণ এ হিসাব থেকে যে কোন কার্যদিবসে তাদের টাকা উঠাতে পারেন; (২) **সঞ্চয়ী হিসাব** — এ হিসাবে টাকা জমাদানকারীগণ নির্দিষ্ট সময়ে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা উঠাতে পারেন ও (৩) **স্থায়ী আমানত** : এ হিসাবে টাকা জমাদানকারীগণ নির্দিষ্ট সময় পরে তাদের টাকা উঠাতে পারেন। আগে উঠাতে হলে কয়েকদিন পূর্বে লিখিত নোটিশ দিতে হয়। সঞ্চয়ী হিসাবে ও স্থায়ী আমানতে টাকা জমা রাখলে ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়।

খ. ঋণদান করা : বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ ঋণদান করে এবং এজন্য সুদ গ্রহণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক টাকা জমাদানকারীদেরকে যে হারে সুদ দেয়, ঋণগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তার চেয়ে অধিক হারে সুদ আদায় করে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এ ধরনের ঋণ নেয়। তবে আমানতকারীরা ব্যাংক থেকে তাদের টাকা উঠাতে চাইলে তাদেরকে টাকা ফেরত দিতে হয়। সুতরাং ব্যাংক তাদের কাছে জমা টাকার সবটুকু ঋণ দিতে পারে না।

গ. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি : বাণিজ্যিক ব্যাংক যে সব চেক প্রদান করে তা দিয়ে অনেকে দেনা-পাওনা মিটায়। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা : অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন পরিচালিত হয়।

ঙ. অর্থ স্থানান্তর করা : বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাহায্যে ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরাপদে স্থানান্তর করা যায়।

চ. সঞ্চয় বৃদ্ধি : বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের সঞ্চয় অর্থ থেকে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ঋণ প্রদান করে। ফলে দেশে পুঁজি গঠনে সহায়তা হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রগতি সাধিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি হিসেবে কাজ করে?

- ক. সর্বশেষ ঋণদাতা খ. অর্থ স্থানান্তরকারী
গ. জনগণের সঞ্চয় গ্রহণকারী ঘ. ব্যবসায়ী ঋণদানকারী

২। কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ?

- ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা খ. বিনিময় হার ঠিক করা
গ. ক্লিয়ারিং হাউজ সুবিধা দান ঘ. ভ্রমণকারীর চেক প্রদান

৩। কোন ব্যাংক নোট ইস্যু করে?

- ক. সোনালী ব্যাংক খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. অগ্রণী ব্যাংক ঘ. জনতা ব্যাংক

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ চারটি কাজ বর্ণনা করুন।
২। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেন যে কোন পরিমাণ নোট ইস্যু করতে পারে না?

উত্তরমালা

অনুশীলনী ১০.১ : ১। গ, ২। ঘ, ৩। খ

অনুশীলনী ১০.২ : ১। গ, ২। ঘ, ৩। ক

অনুশীলনী ১০.৩ : ১। খ, ২। গ, ৩। ক

অনুশীলনী ১০.৪ : ১। ক, ২। ঘ, ৩। খ

ইউনিট ১১

বাংলাদেশের কৃষি

ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ কৃষি থেকে আসে। দেশের অধিকাংশ লোক কর্মসংস্থানের জন্য এই খাতের উপর নির্ভরশীল। সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড (যেমন— সরকারের আয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতি) কৃষির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের এক বড় অংশ দখল করে আছে কৃষি। কৃষিজাত পণ্য বেশি পরিমাণ উৎপাদন করতে পারলে রপ্তানি বেশি হবে এবং আমরা বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হব। এই বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি করা যাবে। দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া রপ্তানি শুল্ক (বা ট্যাক্স) হতে সরকারের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং দেশে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। ফলে দেশে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। বাংলাদেশ এখনও কৃষি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে (খরা ও বন্যায়) প্রায় প্রতি বছরই ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। প্রতি বছর বাংলাদেশকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। খাদ্য সমস্যা সমাধান করতে হলে কৃষির উন্নতি প্রয়োজন। অথচ আমাদের কৃষি নানা সমস্যায় জর্জরিত। এসব সমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের কৃষি খামারের আয়তন, কৃষির গুরুত্ব, সমস্যা এবং সমস্যা কিভাবে সমাধান করা সম্ভব সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

পাঠ ১ : বাংলাদেশের কৃষি খামার

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের কৃষি খামারগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় তা বলতে পারবেন।
- আত্মপোষণশীল উৎপাদন কি বলতে পারবেন।
- আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক উৎপাদন কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

শ্রেণীবিভাগ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের কৃষিক্ষেত্রে ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের খামার পাশাপাশি অবস্থান করছে। এই কৃষি খামারগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

- ১। আত্মপোষণশীল খামার;
- ২। আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক খামার এবং
- ৩। বাণিজ্যিক খামার।

১। আত্মপোষণশীল খামার

এ ধরনের খামারের আয়তন বেশ ছোট। এসব খামারের উৎপাদন এতই কম যে, এখানে নিয়োজিত কৃষক ও তার পরিবার কোন মতে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম হয়। কৃষকের পরিবারের চাহিদা পূরণ করার পর বাজারে বিক্রি করার মত কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। এ ধরনের খামারের উৎপাদনকে আত্মপোষণশীল উৎপাদন বলা হয়। এসব খামারে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক ভোগ মেটানো। আমাদের দেশে এ ধরনের খামারের সংখ্যাই বেশি।

২। আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক খামার

এ ধরনের খামারের আয়তন আত্মপোষণশীল খামারের আয়তন অপেক্ষা বড়। এ ধরনের খামারে পারিবারিক ভোগ ও বাজারে বিক্রি— এ দুই উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হয়। এসব খামারের মালিক একদিকে যেমন পারিবারিক ভোগ বা আত্মপোষণের জন্য উৎপাদন করে, তেমনি উৎপাদিত পণ্যের কিছু অংশ বাজারে বিক্রির জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে থাকে। তাই এসব খামারকে একই সঙ্গে আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক খামার বলা হয়ে থাকে। এ খামারের উৎপাদনকে আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক উৎপাদন বলে।

৩। বাণিজ্যিক খামার

এখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অর্থাৎ কেবলমাত্র বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে ফসল উৎপাদন করা হয়। এ খামারের উৎপাদনকে বাণিজ্যিক উৎপাদন বলা হয়। মুনাফা অর্জন এসব খামারে উৎপাদনের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্যিক খামারের সংখ্যা খুবই কম। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অভাব, দারিদ্র, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশে কৃষি খামারের আয়তন দিন দিন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। তাই আমাদের দেশে আত্মপোষণশীল খামার এবং আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক খামারের সংখ্যা বেশি।

শিল্পোন্নত দেশে কৃষি উৎপাদন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সেখানে খামার মালিকরা নিজস্ব ভোগের জন্য উৎপাদন করে না। তারা তাদের উৎপাদনের সম্পূর্ণ অংশ বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। পরে এই অর্থ দিয়ে তারা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে।

সংক্ষিপ্তসার

- বাংলাদেশের কৃষি খামারগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় : (ক) আত্মপোষণশীল খামার; (খ) আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক খামার এবং (গ) বাণিজ্যিক খামার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। বাংলাদেশের কৃষি খামারগুলোকে কয়ভাবে ভাগ করা যায়?

ক. এক ভাগে	খ. দুই ভাগে
গ. তিন ভাগে	ঘ. চার ভাগে
- ২। আমাদের কৃষি খামার কোনগুলো?

ক. আত্মপোষণশীল ও যৌথ খামার	খ. আত্মপোষণশীল ও বাণিজ্যিক খামার
গ. যৌথ ও বাণিজ্যিক খামার	ঘ. যৌথ ও আত্মপোষণশীল খামার
- ৩। আত্মপোষণশীল উৎপাদন বলতে কি বুঝায়?

ক. পারিবারিক চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত থাকে	খ. পণ্য কম উৎপাদন হয় আংশিক বিক্রি হয়
গ. পণ্য বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদিত হয়	ঘ. পারিবারিক চাহিদা পূরণের পর উদ্বৃত্ত থাকে না।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। আত্মপোষণশীল খামার কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বাংলাদেশের কৃষি খামারকে কয়ভাবে ভাগ করা যায় এবং এগুলো কি কি? যে কোন দুই ধরনের খামার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

পাঠ ২ : বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। রপ্তানি বাণিজ্যের এক বিরাট অংশ জুড়েও আছে কৃষি। অতএব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিচে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস : আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি। জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ আসে কৃষিখাত থেকে। তাই কৃষির উন্নতি হলে জাতীয় আয় বাড়বে এবং এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

২. খাদ্যের যোগানদাতা : আমাদের দেশে খাদ্যের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি। বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে কৃষির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একমাত্র কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের খাদ্য সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

৩. শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি : এদেশে শিল্পের উন্নতি অনেকাংশে কৃষির উপর নির্ভরশীল। পাট, চিনি, বস্ত্র, দিয়াশলাই, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল আমরা কৃষি থেকে পেয়ে থাকি। কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি। এই অর্থ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি আমদানির জন্য ব্যয় করা হয়। কৃষির উন্নতির সাথে সাথে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কৃষির উন্নতি হলে দেশে রাসায়নিক সার, কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি শিল্প গড়ে ওঠে।

৪. কর্মসংস্থান : বাংলাদেশের মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। এদেশের পল্লী এলাকার প্রায় ৮০ শতাংশ লোক কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল।

৫. সরকারি আয়ের উৎস : জমির খাজনা, কৃষিপণ্য পরিবহণ বাবদ রেলভাড়া, কৃষিপণ্যের রপ্তানি শুল্ক প্রভৃতির মাধ্যমে সরকার প্রচুর রাজস্ব পেয়ে থাকে। এই আয় দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়।

৬. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের অধিকাংশই কৃষিপণ্য এবং কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল শিল্পদ্রব্য নিয়ে গঠিত। এই দেশের রপ্তানি আয়ে এই খাতের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

৭. বাসস্থান ও জ্বালানির উপকরণ যোগানো : বাঁশ, বেত, খড়, শন, গোলপাতা ইত্যাদি দিয়ে জনসাধারণ বাড়িঘর তৈরি করে। তাছাড়া এগুলো রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। এভাবে কৃষি গৃহনির্মাণ ও জ্বালানির উপকরণ সরবরাহ করে।

৮. মূলধন গঠনে সাহায্য : কৃষির উন্নতি হলে মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা বেশি সঞ্চয় করতে পারে। এভাবে কৃষি মূলধন গঠনে সাহায্য করে। উপরের আলোচনা হতে এটি প্রতীয়মান হয় যে, কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণস্বরূপ। কৃষির উন্নতির অর্থই হচ্ছে সমগ্র দেশের অগ্রগতি, জনগণের কল্যাণ, সুখ ও শান্তি। সে জন্য আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের কর্মতৎপরতা জোরদার করা প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস কৃষি।
- কৃষি আমাদের খাদ্যের যোগানদার, শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি, এদেশের মানুষের প্রধান পেশা ও সরকারি আয়ের একটি উৎস, কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করি।
- এটি মানুষের জ্ঞানানি ও বাসস্থানের উপকরণ যোগায় এবং মূলধন গঠনেও সাহায্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.২

নৈব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা কত ভাগ কৃষি হতে আসে?
ক. ৩০ ভাগ খ. ৩৫ ভাগ
গ. ৪০ ভাগ ঘ. ৪৫ ভাগ
- ২। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের শতকরা কত ভাগ লোক কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে?
ক. ৬৫ ভাগ খ. ৭০ ভাগ
গ. ৭৫ ভাগ ঘ. ৮০ ভাগ
- ৩। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক জীবিকার জন্য কোনটির উপর নির্ভর করে?
ক. শিল্প খ. কৃষি
গ. চাকরি ঘ. ব্যবসা

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা

উদ্দেশ্য :

এ পাঠে শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন।
- এদেশের কৃষির অনগ্রসরতার কারণ বলতে পারবেন।
- এদেশের কৃষির উৎপাদন কম হওয়ার কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু এদেশের কৃষি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ফলে এদেশে হেক্টর প্রতি ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। কৃষির অনগ্রসরতা এদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা।

নিচে বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাগুলো আলোচনা করা হল :

১। ঙ্গটিপূর্ণ ভূমি সম্পর্ক : এদেশের অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন। তারা অপরের জমিতে দিনমজুর বা বর্গাদার হিসেবে কাজ করে। তারা উৎপাদিত ফসলের সম্পূর্ণ অংশ ভোগ করতে পারে না। জমির মালিকানা না থাকায় কৃষকরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ বোধ করে না।

২। পুরাতন চাষ পদ্ধতি : আমাদের দেশে কৃষিকাজের পদ্ধতি প্রাচীনকালের। আধুনিক চাষ পদ্ধতির সাথে কৃষকরা পরিচিত নয়। কাঠের লাঙ্গল, গরু ও মহিষ দ্বারা এখনও চাষের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ফলে হেক্টর প্রতি উৎপাদন খুবই কম। বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি ১ টন, অস্ট্রেলিয়ায় ও ফিলিপিনে ৭ টন এবং জাপানে ৬ টন শস্য উৎপাদিত হয়।

৩। কৃষকদের দারিদ্র্য এবং মূলধনের অভাব : আমাদের দেশের কৃষকরা দরিদ্র এবং ঋণগ্রস্ত। সারা বছর তাদের অভাব লেগেই আছে। তাদের সঞ্চয় নেই বললেই চলে। ফলে ইচ্ছা থাকলেও মূলধনের অভাবে কৃষকরা কলের লাঙ্গল, আধুনিক যন্ত্রপাতি, ভাল সার ও বীজ ব্যবহার করতে পারে না। তাই উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

৪। জমির খন্ড-বিখন্ডতা : বাংলাদেশের জমির টুকরোগুলোর আয়তন খুবই ছোট। এগুলো বহুসংখ্যক খন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অনেক জমির আয়তন এত ছোট যে কৃষকরা চাষের সময় তাদের লাঙ্গল ও গরু ঠিকমত যোরাতে পারে না। জনসংখ্যার চাপ, উত্তরাধিকার আইন, দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে জমিগুলো খন্ড-বিখন্ড হচ্ছে।

৫। সার ও বীজের অভাব : কৃষিজাত দ্রব্যের ফলন বাড়ানোর জন্য ভাল বীজ ও সার ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু মূলধনের অভাবে কৃষকগণ সার ও ভাল বীজ সংগ্রহ করতে পারে না। ফলে জমির ফলন খুবই কম হয়।

৬। ক্রটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা : ক্রটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার দরুণ কৃষকরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। ফলে তারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ পায় না। কারণ তাদের পরিশ্রমের ফল দালাল ও ফড়িয়ারা ভোগ করে। তারা মোটামুটিভাবে নিজের পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের জন্য উৎপাদনে আগ্রহী হয়। তাই দেশে কৃষিতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কম।

৭। প্রাকৃতিক দুর্যোগ : প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিশেষ করে- বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, ঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়।

৮। কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ও শস্যের রোগ : প্রতি বছর কীট-পতঙ্গের আক্রমণ এবং ফসলের নানারকম রোগের ফলে উৎপাদিত শস্যের এক বড় অংশ নষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় কীটনাশক ওষুধের অভাব এবং কৃষকদের অজ্ঞতার দরুণ তারা কীট-পতঙ্গ দমনে অক্ষম।

৯। সেচ ব্যবস্থার অভাব এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা : আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন হয়নি। ফলে আমাদের কৃষি একান্তভাবেই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ জলসেচের জন্য আমাদের কৃষকগণ বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। সময়মত বৃষ্টিপাত হলে ফসল উৎপাদন ভাল হয়। কিন্তু অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বা অসময়ে বৃষ্টি ইত্যাদির ফলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

১০। ঋণের অভাব : আমাদের কৃষক সমাজ খুবই গরিব। কৃষি উপকরণ ক্রয়ের মত প্রয়োজনীয় অর্থ তাদের নেই। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে টাকা ধার পাওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। পাওয়া গেলেও তার জন্য খুব বেশি সুদ দিতে হয়। সরকার কৃষকদের যে ঋণ দেয় তা পর্যাপ্ত নয়। এসব কারণে কৃষকগণ কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না। ফলে ফসলের ফলন কম হয়।

১১। শিক্ষার অভাব : আমাদের দেশের কৃষকরা নিরক্ষর। তাদের কৃষি বিষয়ক শিক্ষা নেই। তারা উন্নত কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই তারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে না।

এছাড়া ক্রমাগত চাষের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস, জলাবদ্ধতা এবং আশংকাজনকভাবে গবাদি পশুর সংখ্যা হ্রাস আমাদের কৃষি উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

সংক্ষিপ্তসার

- বাংলাদেশের কৃষির প্রধান সমস্যা হচ্ছে : (১) ক্রটিপূর্ণ ভূমি সম্পর্ক (২) পুরাতন চাষ পদ্ধতি, (৩) কৃষকদের দারিদ্র্য এবং মূলধনের অভাব, (৪) জমির খন্ড-বিখন্ডতা, (৫) সার ও বীজের অভাব, (৬) ক্রটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা, (৭) প্রাকৃতিক বিপর্যয়, (৮) কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ও শস্যের রোগ, (৯) সেচ ব্যবস্থার অভাব ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা, (১০) ঋণের অভাব, (১১) শিক্ষার অভাব ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। এদেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা কি?
ক. কৃষির অনগ্রসরতা খ. শিল্পের অনগ্রসরতা
গ. অশিক্ষা ঘ. মূলধনের অভাব
- ২। বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদন কত ?
ক. প্রায় ১ টন খ. প্রায় ২ টন
গ. প্রায় ৬ টন ঘ. প্রায় ৭ টন
- ৩। আমাদের দেশের কৃষক উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ বোধ করে না কেন ?
ক. অশিক্ষার কারণে খ. দারিদ্র্যের কারণে
গ. জমির মালিকানা না থাকার কারণে ঘ. ঋণের অভাবের কারণে

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাগুলোর বর্ণনা দিন।

পাঠ ৪ : বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের উপায়

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষির সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় তা বলতে পারবেন।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু আমাদের কৃষি নানা সমস্যায় আক্রান্ত এবং অনগ্রসর। আমাদের অর্থনীতিতে কৃষির সামগ্রিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এসব সমস্যা সমাধানে তৎপর হওয়া প্রয়োজন। এসব সমস্যা দূর করতে না পারলে কৃষির উন্নতি সম্ভব হবে না। কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে না। বাংলাদেশের কৃষির সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার : বাংলাদেশের কৃষির উন্নতির জন্য প্রাচীন চাষ পদ্ধতি পরিবর্তন করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চাষাবাদ প্রবর্তন করতে হবে। কলের লাঙ্গল, ফসল নিড়ানো ও ফসল কাটার যন্ত্র, সেচের জন্য যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। অবশ্য বর্তমানে আমাদের দেশে কৃষিকাজে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

২। সমবায় কৃষি : সমবায় কৃষি খামার ও অন্যান্য কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলো একত্রিত করে যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করলে যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিকাজ করা সহজ হবে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বাড়বে এবং জমির খন্ড-বিখন্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার সমস্যার সমাধান হবে। এ ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

৩। সার ও উন্নত বীজের ব্যবস্থা : ভাল সার ও উন্নত বীজের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো যায়। কৃষকদের কম দামে সার ও উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করতে হবে।

৪। সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস : কৃষির উন্নতি করতে হলে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। আধুনিক পদ্ধতিতে জলসেচের ব্যবস্থা করতে হবে। খাল, পুকুর ও নলকূপের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা সম্ভব।

৫। বন্যা নিয়ন্ত্রণ : বন্যার ফলে আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়। তাই কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। পর্যাপ্ত কৃষি ঋণের ব্যবস্থা : কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। দারিদ্র্যের কারণে কৃষকগণ প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ কিনতে পারে না। অল্প সুদে ও সহজ শর্তে কৃষকদের ঋণ দিতে হবে। তাহলে ঋণের অর্থ দিয়ে কৃষকরা হালের বলদ, বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কিনতে পারবে।

৭। বাজার ব্যবস্থার উন্নতি : আমাদের কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের যেসব সমস্যা আছে সেগুলো দূর করতে হবে। কৃষক যাতে তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। সমবায় বিক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠা করে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব।

৮। শিক্ষা বিস্তার : কৃষকদের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের কাজে উৎসাহিত করতে হবে। তাদেরকে আত্ম-বিশ্বাসী করে তোলার চেষ্টায় সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

৯। কীটনাশক ওষুধের ব্যবস্থা : কীট-পতঙ্গের হাত হতে ফসল রক্ষা করতে হলে কৃষকদের পর্যাপ্ত পরিমাণ কীটনাশক ওষুধ সরবরাহ করতে হবে।

১০। সহকারী পেশার ব্যবস্থা : কৃষকরা বেশ কয়েক মাস কর্মহীন থাকে। এ সময়ের জন্য কৃষকদের কুটির শিল্প বা অন্য কোন খাতে সহকারী পেশার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাদের আয় বৃদ্ধি পায়।

১১। কৃষি গবেষণা : বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষি গবেষণার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা আরও জোরদার করতে হবে।

উপরের ব্যবস্থাগুলো কার্যকর করতে পারলে বাংলাদেশের কৃষি সমস্যামুক্ত হবে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং জাতীয় উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

সংক্ষিপ্তসার

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার, (২) সমবায় কৃষি, (৩) সার ও উন্নত বীজের ব্যবস্থা, (৪) সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, (৫) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, (৬) কৃষি ঋণের ব্যবস্থা, (৭) বাজার ব্যবস্থার উন্নতি, (৮) শিক্ষা বিস্তার, (৯) কীটনাশক ওষুধের ব্যবস্থা, (১০) সহকারী পেশার ব্যবস্থা ও (১১) কৃষি গবেষণা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কৃষির ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার সহজ হবে?
- ক. কৃষকদের ঋণ দিলে
খ. জলাবদ্ধতা দূর করলে
গ. সমবায় কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা করলে
ঘ. সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করলে
- ২। আমাদের কৃষিক্ষেত্রে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা কিভাবে কমানো যায়?
- ক. বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে
খ. সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করে
গ. শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে
ঘ. পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ দিয়ে
- ৩। কৃষকদের সহকারী পেশার প্রয়োজন কেন?
- ক. তারা বেশি পরিশ্রম করতে পারে বলে
খ. তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি বলে
গ. তারা বছরে বেশ কয়েক মাস কর্মহীন থাকে বলে
ঘ. তাদের পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়নের উপায়গুলো আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

- অনুশীলনী ১১.১ : ১। গ ; ২। খ ; ৩। ঘ
অনুশীলনী ১১.২ : ১। খ ; ২। ঘ ; ৩। খ
অনুশীলনী ১১.৩ : ১। ক ; ২। ক ; ৩। গ
অনুশীলনী ১১.৪ : ১। গ ; ২। খ ; ৩। গ

ইউনিট ১২

বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য

ফিগকি

th tkvb AvaybK ivto^a RbMtiYi weifbraitbi cOqvRb tglUveri ZwmM^h wki RvZ `teⁱ thvMvb evotZ nq/ t^htki mvguMK Dbatbi ^hti^oµgea^ovb RbMtiYi Kgm^svb Mto Zj tZ, Kwl i Dci Prc Kgyeri ZwmM^h I Kwl ctYⁱ evRvi Mto Zj tZ wktⁱvbqb Acwivnh^o evsj vt^htki t^hti^o GKB K^v c^ohvr^o]

cv 1 : wktⁱ i cOqvRbxqZv I Kgm^svb m^o

D^hik^o :

GB cv tktⁱ Avci^o-

- wktⁱvbqb^o cOqvRbxqZv wK Zv ej tZ cvi^oteb|
- Kwl I wktⁱvbqb wKf^ote ci^outi i cwi^ociK Zvi e^ovL^ov w^o tZ cvi^oteb|
- Kgm^svb Mto Zj tZ wktⁱ i cOqvRbxqZv wK Zv ej tZ cvi^oteb|
- Av^o wbf^opkj A^o BwZ Mto Zj tZ wktⁱvbqb^o fi^ogk^o wK Zvi e^ovL^ov w^o tZ cvi^oteb|
- evsj vt^htki wktⁱvbqb^o Dcvqmg^o wK Zv ej tZ cvi^oteb|

evsj vt^htki A^o BwZ tZ wktⁱ i ^oi^o“Zⁱ

wb^o wbf^o w^oot^oKiv t^otk evsj vt^htki A^o BwZ tZ wktⁱ i ^oi^o“Zⁱ Av^o vPbv Kiv nj :

1| RvZiq Drcv^o b ep^ox : evsj vt^htki gv^o wmcOy Avq Z^o v RvZiq Avq ep^ox Ki tZ ntj wktⁱvbqb Acwivnh^o cv^o exi Ab^o vb^o Dbqb^o kxj t^otki Zj bvq Avgv^o i gv^o wmcOy Avq LpB Kg- gv^o 283 gw^o K^o Wjvi | Avgv^o i Kwl i tn^o±i cOZ Drcv^o b Kg Ges wki I AbM^oni | t^oKej gv^o Kwl i Dbatb G Ae^o vi cwi^o eZ^o m^o e bq| wktⁱvbqb^o gra^otgB RvZiq Avq Ges gv^o wmcOy Avq ep^ox Kiv m^o e| m^o Zivs A^o BwZK Dbatbi j t^oq^o `Z wktⁱ i c^ohvi mvab Ki tZ nte|

2| Kwl Dbatb : evsj vt^htki Kwl c^oavb t^otk| wK^o wktⁱvbqb e^o Z^o Kwl i DbwZ Ges AvaybK^o K^o iY m^o e nte bv| AvaybK c^oh^o wbf^o Kwl e^o v G t^otk Mto Zj tZ ntj Kwl h^o s^o wZ, i mvqwbK mvi, KxUvbkK I l^o p c^o h^o Z^o thvMvb evotZ nte| GRb^o wktⁱ i Dci wbf^o Ki tZ nte| ZvOvov Kwl t^oq^o Drcw^o Z K^o Pvgv^o t^o evRvi I wktⁱvbqb^o Dci wbf^o K^o | Kwl Dbatbi ^oti^o wktⁱ i `Z c^ohvi cOqvRb| ZvB Kwl I wktⁱ i Dbatb ci^o uti wbf^opkj |

3| teKvi m^o m^o vi mgvavb : evsj vt^htki RbmsL^o v `Z ep^ox cv^o t^o | GB evowZ RbmsL^o v Kwl t^otk wki t^oq^o t^o v^o s^o t^o i Rb^o wktⁱvbqb Avek^o K| Kwl tZ A^o t^o K Av^o MB evowZ t^o v^o Ki Kvi^o t^o Z^o weivR Ki t^o Q| GgZie^o vq Awak msL^o K wki -Kvi Lvov Mto Z^o t^o teKvi m^o m^o vi mgvavb Kiv m^o e|

4| cO^o K^o ZK m^o ut^o i m^o p^o ye^o envi : evsj vt^htki wktⁱ vrcv^o t^o bi Rb^o cOqvRbxq K^o Pvgv^o I Ab^o vb^o cO^o K^o ZK m^o ut^o i t^o q^o | thgb- cvU, K^o MR, w^o t^o g^o U, P^o gov, mvi c^o h^o wZ wktⁱ i Rb^o c^o h^o i cwi^o gv^o t^o K^o Pvgv^o G^o t^o k cv^o l qv hvq| `Z wktⁱvbqb^o gra^otg GB m^o K^o K^o Pvgv^o I Ab^o vb^o m^o ut^o i m^o p^o ye^o envi Kiv t^o t^o Z cv^o t^o |

5| Kwl i Dci wbf^o Zv nvm : evsj vt^htki A^o BwZ GLbl Kwl i Dci wbf^opkj | GB wbf^o Zvi nvi GK mg^o A^o t^o K tewk w^o Q| eZ^o t^o K^o t^o g^o G^o t^o t^o Q, RvZiq Av^o t^o q^o kZKiv 35% Kwl i Ae^o vb| h^o GB wbf^o Zv K^o g^o t^o q^o Avbv hvq A^o B^o wktⁱvbqb `Z Zi Kiv hvq Z^o teB t^o K^o m^o BwZ m^o e nte|

6| A_ŋwZK w`wZkxj Zv : evsj v`k GKwJ cŋKwZK `thMcŋY GjvKv| ZvB KwRvZ cY` Drcv`tb
AwbŋqZv teuk| mZivs w`wZkxj A_ŋwZ Mto Zj tZ wkt`vbaq Acwvnhŋ Zte t`tki A_ŋwZK
w`wZkxj Zvi `ŋ_KwJ I wkt`i hJMcR DbqB Avek`K|

7| iBwb epX I Avg`wb nvm : eZŋv`b evsj v`tki iBwb cY`i cwigvY I msL`v AZ`S-bMY`| Gt`i
AwaKvskB KwRvZ cY`, wek`evRv`i G`tj vi `vgI Kg| Ab`w`tk Avg`wb cY`i msL`v A`bK, teuki fVMB
wkt`RvZ cY` Ges `vtgl iBwb `ŋe`i tPtq A`bK teuk| dtj emYR` NvUwZ tetoB PtjtQ| wkt`vbaq`bi
gva`tg wek`i iBwb `ŋe` Drcv`b Kti `eŋ`w`kK gy`v ARŋ Ki tZ nte| dtj Avg`wbI nvm cvte| GfvteB Avq
e`tg fvi mvg` AbKj nte Ges Gt`tk Av`wbF`Kxj A_ŋwZ Mto DVte|

8| cŋZi ŋv e`e`v kw`kxj x Kiv : evsj v`tki cŋZi ŋv e`e`v kw`kxj x Ki tZ ntj th wecj cwigvY A`k`;
I hvbevb eZŋv`b wek`k t`tk Avg`wb Ki tZ nq tm`tj v t`tk Drcv`b i e`e`v wbtZ nte| wkt`vbaq`bi
gva`tg Gme `ŋe` t`tki Af`S`ŋi Drcv`b Kiv m`e|

9| cwienb I thvMv`thvM e`e`vi DbwZ : th`KvB t`tki wkt`vbaq`bi ceRZ`nj cwienb I thvMv`thvM e`e`vi
DbqB| evsj v`k hvbevb, cwienb Ges thvMv`thvM mspu`S-mKj cKvi hS`cwZ I DcKiY wek`k t`tk
Avg`wb Kti | dtj Gt`ŋt` mwxgZ DbqB m`e ntqtQ| hvbevb, thvMv`thvMi hS`cwZ I DcKiYmg` t`kx
wkt`i Kvi Lvbvq Drcv`b Ki tZ nte| Zvntj cwienb I thvMv`thvM e`e`vi DbwZ nte|

evsj v`tki wkt`vbaq`bi Dcvqmg`

evsj v`tki mweR DbqB`bi Rb` wkt`vbaq`bi AwZ `i`ZcYŋ G t`tki wkt`vbaq`bi Rb` wbaej wLZ e`e`v MŋY
Kiv cŋqvRb :

1| miKv`i fvgKv : evsj v`tk wkt`vbaq`bi cŋqv`K tRvi`vi Kivi `ŋ`miKv`i m`uq fvgKv cŋqvRb|
mwK wkt`i bxwZ cŋvqB I ev`evq`bi mv`_mv`_bZb bZb wkt`i `vct`bi Dt``vM miKv`i KvQ t`tkB AvmtZ
nte| GKw`tk RvZxqKiYKZ wkt`i mg`ni c`bMvB, m`u`vi Y I m`pZ cw Pj bvi `wqZ; thgb miKv`i; tZgw
temiKwi LvZ Mto DVw wkt`i weKv hvZ AbKj cwitek cvq Zv wvŋZ Kivi `wqZ; miKv`i |

2| temiKwi Dt``v`v`i Drm`v cŋvb : temiKwi Dt``v`v`i h_vh`fvte w`K wbt`Rbv, mrvh` I
m`thvMZv cŋvb Kti wkt`i c`R webtq`M AvKl`v`xq Ki tZ nte| mnR ktZ`FY`vb, Ki gl Kd, evRvi A`S`TY
BZ`w` m`eav temiKwi Dt``v`v`i t`K AvKó Ki te|

3| gj ab MVb : gj a`bi AfvteB Avgv`i t`tk wkt`vbaq`bi eva`cŋB nt`Q| gj ab MV`b RbMY`tk Drm`vZ
Ki tZ nte| t`tk AwaK msL`K e`vsk I gj abx ms`v Mto Ztj RbM`Yi ŋz`m`Aq hvZ Gme gj abx
cŋZŋv`b Rgvi m`thvM epX cvq Zvi e`e`v wbtZ nte|

4| cwienb I thvMv`thvM e`e`vi DbwZ : t`k`k `Z wkt`wqZ Ki tZ cŋqvRb DbZ cwienb I thvMv`thvM
e`e`v, hvZ Aí mg`tq I Kg Li`P wevfb`v`b t`tk wkt`i GjvKvq KuPvgv Gtm t`cŋQ Ges Abj`fcvte
wkt`i RvZ cY` evRvi RvZ Kiv m`eavRbK nq|

5| LwbR m`u`i DbqB : `Z wkt`vq`bi Rb` t`tki LwbR m`u`i DbqB GKv`S-cŋqvRb| tj vnv, Kvj v,
t`ctU`vj qvg cŋvZ gj`evb LwbR m`u`i Ave`vi I Dt`Evj`bi Dt`tk` fZw`E`K Rwi c Pj bmn cŋqvRbxq
me e`e`v wbtZ nte|

6| kw` m`u` epX : wkt`i cŋv`i Rb` cŋqvRb ch`B we`jr kw` I LwbR tZj | Gme kw` m`u`i
mnRj f`Zv wkt`vbaq`b Drm`v m`j Kti | GB Dt`tk` cwb we`jZ I M`vm we`jZ m`j I m`pZ weZiY e`e`vi
Rb` ch`B msL`K DbqB cK`i MnY Ki tZ nte|

7| `ŋ klgK m`j : evsj v`tk `ŋ klg`Ki tek Afve itqtQ| wkt`vbaq`bi Dt`tk` `ŋ klg`Ki thvMv
epX i Rb` t`tk Kw`i Mwi I tckw`f`E`K wkt`i cŋv`i NUvZ nte| GKbmv`_ klgKMY`tk wkt`iZ ntZ nte|
Zvntj Kw`i Mwi Avb I `wqZm`u`b`k`lg`Ki msL`v epX cvte|

8| mōz cwi Kí bv MōY : t`k tK wkí vqZ Ki tZ mōz cwi Kí bvi „i“Z; Ab`xKvh` G Rb` mWk wkí bWZ cVqb
cQvRb| thme wkí t`k xq KvPvgj e`envi Kiv hvq, tm ai tbi wkí AvtM cZōv Ki tZ nte| GQrov t`k I
we t`k ht`ó Pwin`v AvtQ, G ai tbi wkí cZōv Ki tZ nte| GmKj e`ev MōY Ki tZ t`k `Z wkí vqab
m`e nte|

mvi mst`c

- RvZxq Drcv`b ep`x, `Z A`wZK Dbqab, Rxebhv`vi gvb Dbqab, Kwí Dbqab, teKvi mgm`v mgvavb, Kwí i Dci wbf`Zv nwm, i Bwb ep`x c`wZ j`q` AR`b wkí vqab tKvb weKí tbB|
- wkí vqab Mto bv DVvi eú Kvi Y i tqtQ| mi Kv`i i mWk fvgKv MōY, temi Kwí D`v`v` i tK Drm`v c`vb, gj ab MVb, cwi enb I thvMv`thvM e`ev i DbwZ, kw`-m`u` ep`x, `q` klgK mō I h_vh` cwi Kí bv MōYi gva`tg `Z wkí vqab m`e|

cv`V`Ei gj`vqb : 12.1

`be`K c`e

mWk D`Ei i cv`k Wk (v) w`P` w`b:

- 1| ersj vt`k wkí i DbwZ ntj`k nte?
K. Kwí i DbwZ e`v`Z
L. teKvi mgm`v ep`x
M. Kwí i DbwZ
N. thvMv`thvM e`ev Acwi ewZ`
- 2| ersj vt`k i wkí vqab wkími Dci wbf`Kxj ?
K. we t`k t`k wkí mvgM` msM`
L. thvMv`thvM I cwi enb Dbqab
M. Kwí RvZ cY` i Bwb
N. abx e`v` i AvMgb

i Pbv`j K c`e

- 1| ersj vt`k wkí vqab „i“Z; e`v`L`v Ki`b|
- 2| ersj vt`k wkí vqab Dcvqmg` eY`v Ki`b|

msw`B-D`Ei c`e

- 1| Kgf`s`vb Mto Zj tZ wkí i cQvRbxqZv`k?
- 2| Av` wbf`Kxj Zv AR`b wkí i fvgKv`k?
- 3| D`v`vi Af`te wKf`te wkí vqab e`v`Z nq?
- 4| gj atbi Afve`k f`te wkí vqab tK evavM`-Kti?

mWK DĚti i cvtk uJK (√) wPý w` b:

1| Kwi wkí ej tZ wK eSvq?

K. th wkí Drcv` tb tKvb ai tbi hšij vřM bv

L. Kg klgřK Nřivqv cwi řetk th wkí Drcv` b nq

M. RivRyKwi eřm th wkí Drcv` b Kiv nq

N. řQvULvU Nři eřm th wkí Drcv` Z nq

2| evsj vř` řki A_řwřZř wkí LvřřK KZ řvřřM řvřřM Kiv nq?

K. 4

L. 2

M. 3

N. 6

3| evsj vř` řki tKvb řRj v, řj v ři kg wkí i Rb` wL`vř?

K. XvKv, dwi`cj l ewi kvj L. hřkvi, Lj bv l Kwóqv

M. ivRkvnř, cvebv l e, ov N. wřřj U, Křřj ř tbvqvLvř x

i Pbvřj K cřke

1| evsj vř` řki Kwi wkí i eYřv w` b|

2| evsj vř` řki řř`wkí i GKw eYřv w` b|

mswřřB-DĚi cřke

1| řř`ř Kwi wkí i cv_ř` wř` ř Ki`b|

2| evsj vř` řki Zvř wkí mřúřKřnsřřřc Avřj vPbv Ki`b|

cvV 3 : ersj v`k i ep` vqZb wki

Df`k` :

G cvV tkfI Avciib-

- ersj v`k i c`vb c`vb wki wK Zv ej tZ cvi teb |
- cvU, e`i wPib, KvMR I imvqubK mvi wki m`utK`mst`c eY`v w`tZ cvi teb |
- ersj v`k i ep` vqZb wki RvZxqKiY Kivi ct`h h`p` w`tZ cvi teb |
- tKb e`w`g`v`j Kvbvq wki BDwbUmgn b`-Kiv ntqtQ Zvi th`w`KZv ej tZ cvi teb |

ersj v`k ep` vqZb wki mg`ni gfa` cvU, e`i wPib, KvMR, wmtgU, mvi, tj Sn I B`uvZ, RvnrR wbg`Y, I l`p I imvqubK `e`, `Zj tkvabMvi, fviX Bw`nbqwis, `Zj I M`vm c`f`vZ w`tkl f`vte D`j L-Kiv th`tZ cvti | wbtP ersj v`k i ep` vqZb wki i msw`jB weeiY t` l`q`nj :

1 | cvU : cvU ersj v`k i Ab`Zg c`vb wki | 1947 mvtj G t`tk tKvb cvU wki wQj bv | 1951 mvtj ersj v`k c`g cvUKj `wcz nq | eZ`v`b G msL`v 78w | cv`exi tgvU Drcw`Z cvt`i kZKiv c`q 50 f`vM ersj v`k Drcb`nq | GLv`b c`q 14 j`h | GKi R`igtZ Avbg`wbK 50 j`h tej cvU Drcw`Z nq | GB wki wbt`q`wRZ k`igtKi msL`v c`q 2 j`h | G me cvUKj i ewl`R Drcv`b`h`gZv c`q 6 j`h Ub |

KuPvcvU I cvURvZ`e` i B`wb Kti GK mgq c`p`i `e`w`kK g`v` Avq nZ | GRb` cvU `Y`f`i b`v`g` c`w`wPZ | 1995-96 mvtj GB LvZ t`tk Avq ntqtQ c`q 420 w`g`j`q`b` g`w`K`B` Wj vi |

2 | e`i : e`w`ki ersj v`k i w`Zxq ep`Eg wki | ersj v`k eZ`v`b 65 wU e`i I m`zvKj i`tqtQ | Gi KuPvg`tj i Rb` c`q m`u`Y`v`te Avg`wbi Dci w`f`P Ki`tZ nq | XvKv, P`EM`tg, bvi vqYMA, K`u`o`q`v, Lj bv c`f`vZ AA`tj AwaKisk e`i Kj `tj v Aew`Z | Avg`v` i tgvU Kvctoi th Pwn`v AvtQ Zvi A`t`R GB wki t`tk tglv`bv m`e` nq |

3 | wPib : eZ`v`b ersj v`k wPib Kti i msL`v 18wU Ges Gt` i Drcv`b`h`gZv c`q 2 j`h Ub | Zte AvtLi Drcv`tbi Dci wPibi Drcv`b w`f`P`k`xj | ersj v`k Drcw`Z wPibi c`w`g`Y Pwn`vi Zj bvq c`q 70 nvRvi Ub Kg | ZvB w`k` t`tk GB c`w`g`Y wPib Avg`wbi Ki`tZ nq | ersj v`k i ep`Eg wPibKj wU K`u`o`q`v tRj vi `k`v`q Aew`Z |

4 | KvMR : KvMR Drcv`tbi ersj v`k `qsm`u`Y` 1953 mvtj ZrKvj xb c`w`K`v`b wki Db`q`b ms`vi Df`v`tM P``tNvbvq t`tki c`g KY`E`j`x KvM`t`Ri Kj wU `wcz nq | GB Kvi LvbwU i ewl`R Drcv`b`h`gZv 30,000 Ub | c`ti GKB ms`vi Df`v`tM Lj bvq GKwU w`DRw`c`U w`g`j `v`cb Kiv nq | Gi Drcv`b`h`gZv `w`bK 100 Ub | m`y` i`e`t`bi tMl`q`v KvV G w`g`tj i KuPvg`j | cvKk`tZ `wcz b`_`e`l`zj tccvi w`g`tj i `w`bK Drcv`b`h`gZv 40 Ub | GB w`g`tj i KvMR DrK`o`g`v`tbi | GQov w`tj`t`Ui QvZ`tK ewl`R 30 nvRvi Ub`h`gZv m`u`b`e`GKwU KvM`t`Ri g`U`Zwi i Kvi Lvbv `wcz ntqtQ |

5 | imvqubK mvi : Kul c`vb ersj v`k Drcv`b ep`xi Rb` imvqubK mvti w`tkl c`q`vRbxZv i`tqtQ | c`w`K`v`b Avg`tj w`tj`t`Ui t`d`A`M`t`A` t`tki c`g mvi Kvi LvbwU `wcz nq | c`ti tNvovkv`tj w`Zxq Kvi LvbwU `wcz nq | P`EM`tg wU, Gm, w`c` mvi Kvi Lvbvq eQti 1 j`h 52 nvRvi Ub wU`c`j m`c`vi d`m`t`d`U Drcw`Z ntq `v`tK | Av`M`t`A`i wRqv mvi Kvi Lvbi ewl`R Drcv`b`h`gZv 5 j`h 28 nvRvi Ub | Pxbv m`v`q`Z`v`q bvi vqYMA`GKwU g`S`w`i AvKv`i i Ges P`EM`tgi Avt`bv`q`v`i`Z GKwU eo ai`t`bi mvi Kvi Lvbvq Drcv`b`i`i` ntqtQ | P`EM`tgi GB BDw`i`q`v` mvi Kvi Lvbi Drcv`b`h`gZv ewl`R c`q 5.61 j`h Ub | ZvQov, Rv`g`j`c`j`c`j`v`k BDw`i`q`v` mvi Kvi Lvbi Drcv`b`h`gZv ewl`R 95 nvRvi Ub |

6 | wmtgU : wmtgU Drcv`tbi ersj v`k tgv`t`U i `qsm`u`Y`bq | `f`axbZv j`v`f`i AvtM ersj v`k GKwU g`v` wmtgU Kvi Lvbv wQj w`tj`t`Ui eZ`v`b Kvi LvbwU`K m`u`b`w`i`Z` Kti Drcv`b`h`gZv 3 j`h tglv`UK U`t`b` Db`z`

cvW 4 : wktfi i vbxqKiY

Dfi k :

G cvW tktl Avciab-

- wktfi i vbxqKiY wK Zv ej tZ cvi tēb |
- wktfi i vbxqKiYi Kvi Ymgā ej tZ cvi tēb |

wktfi i vbxqKiY KvTK etj

tKvb GKwJ wētkl wktfi i AwāK msL K Kvi Lvbn tKvb GKwJ wbn̄ ̄ ̄ vtb Mto DVv ev tK̄ ̄ xFZ nI qvTK wktfi i vbxqKiY ev tK̄ ̄ xqKiY etj | mvaviYZ tKvb GK ai tbi wki Mto tZvjvi Rb̄ wētkl cwi tek I mthvM-mjeavi c̄qRb nq | c̄KwZK m̄ú` , tFStMwj K Ae v̄b Ges Ab v̄b mthvM-mjeavi t̄j̄t̄ wērfbwAĀtj i gtā wērfb̄z̄ v v̄tK | ZvB mthvM-mjeav I c̄qRb Abm̄t̄i Drcv̄ b c̄Zōvb t̄j̄ v wētkl v̄b ev AĀj wēf̄p̄b Kti | GRb̄ GUvTK AvĀwj K k̄t̄wēf̄MI etj | D`vniY t̄fc, evsj v̄t̄ t̄ki bvi vqYMĀ I Lj bvq cvU wki , wmtj t̄U Pv wki , ivRkvn̄t̄Z ti kg wki , mBRvij v̄t̄U Nwo wktfi i vbxqKiY ntqt̄Q |

wktfi i vbxqKiYi Kvi Ymgā

wktfi i vbxqKiY A t̄bK t̄j̄ v Kvi Ȳi Dci w̄f̄p̄k̄j̄ | Kvi Y t̄j̄ v̄tK Pvi f̄v̄t̄M f̄v̄M Kiv hvq | h_v- 1 | c̄KwZK Kvi Y, 2 | A_w̄w̄ZK Kvi Y, 3 | ivR_w̄w̄ZK Kvi Y Ges 4 | gb_w̄w̄ZK Kvi Y |

1 | c̄KwZK Kvi Y

(K) Rj evqy : wktfi i vbxqKiY A t̄bKvst̄k Rj evqj̄ Dci w̄f̄p̄k̄j̄ | GK GK ai tbi wki Rb̄ GK GK ai tbi Rj evqj̄ c̄qRb nq | thgb- Av̄ ̄ Rj evqy eqb wki Rb̄ Dc̄thvMx | GB Kvi t̄YB Bsj v̄t̄Ūi j̄ v̄v̄k̄v̄q̄v̄t̄i e wktfi i vbxqKiY ntqt̄Q |

(L) KuPvḡt̄j̄i b̄KU : wktfi i Rb̄ KuPvḡj̄ Acwi nvh̄ ̄ ZvB KuPvḡj̄ thLv̄t̄b c̄P̄i cwi gv̄t̄Y cvl qv hvq tmLv̄t̄bB wktfi i vbxqKiY ntq v̄tK | thgb – PĀEM̄g AĀtj̄ c̄P̄i euk Drcb̄enq etj P̄ t̄Nvbq KvMR wki Mto D̄v̄t̄Q |

(M) kw̄³ m̄ú` i b̄KU : Kvi Lvbn Pv̄j̄ v̄tZ kw̄³i c̄qRb nq | m̄Zivs Kq̄j̄vi Lub, t̄Zt̄j̄i Lub, Rj wē`j̄Z kw̄³, M̄vm kw̄³i Drcw̄ t̄j̄vi w̄b̄KU wki c̄Zōvb t̄j̄ v t̄K̄ ̄ xFZ nq | D`vniY t̄fc, Kv̄SvB I PĀEM̄tg c̄w̄b wē`j̄Z kw̄³ m̄t̄R cvl qv hvq etj B PĀEM̄tg A t̄bK wki Kvi Lvbn c̄Zw̄Z ntqt̄Q |

(N) Db̄z̄ cwi enb I thvM̄thvM mjeav : Db̄z̄ cwi enb I thvM̄thvM mjeavi Dci wktfi i vbxqKiY eūj̄ vst̄k w̄f̄p̄ Kti | th mKj̄ v̄t̄bi m̄v̄t̄_ b`-b`x, tij c_, moKc_ I wēgv̄c̄t̄_i Nwb̄o thvM̄thvM e`ē v̄ Av̄t̄Q, mvaviYZ tmme v̄t̄bB wki Kvi Lvbn Mto I t̄v | GRb̄B evsj v̄t̄ t̄ki PĀEM̄g I Lj bv̄t̄Z Ges f̄vi t̄Zi gv̄v̄B I Kuj̄ KvZv c̄f̄w̄Z kn̄ti wērf̄b̄w̄k̄t̄i i vbxqKiY ntqt̄Q |

2 | A_w̄w̄ZK Kvi Y

(K) evR̄v̄t̄i i b̄KU : th tKvb wki c̄Zōvb Zvi c̄qRvRbx̄ KuPvḡj̄ m̄t̄R Kg Li t̄P msM̄ni Rb̄ Ges Drcw̄ Z wki Rv̄Z` ē` m̄t̄R wēμ̄q Kivi Rb̄ eo eo evR̄v̄t̄i i w̄b̄KU Mto I t̄v | G Kvi t̄YB eo eo kn̄ti i w̄b̄K̄t̄U b̄v̄v̄ c̄K̄vi wki Mto I t̄v | Avḡt̄ i t̄ t̄kI XvKv, PĀEM̄g, Lj bv̄ c̄f̄w̄Z eo eo kn̄ti wki t̄K̄ ̄ xFZ |

(L) k̄t̄gi m̄nRj̄ f̄Zv : wktfi i Rb̄ k̄t̄gK c̄qRb | th v̄t̄b m̄t̄R Ges mj̄ t̄f` ̄ ̄ I Av̄f̄Ā k̄t̄gK cvl qv hvq tm v̄t̄bB mvaviYZ wki c̄Zōvb Mto I t̄v | XvKv, bvi vqYMĀ, PĀEM̄g, Lj bv̄ c̄f̄w̄Z Gj̄ vKvq mj̄ t̄f` k̄t̄gK cvl qv hvq etj B G me v̄t̄b wki Kvi Lvbn Mto t̄Zvj̄ v m̄ē ntqt̄Q |

3| ivR%bWZK Kvi Y

ivR%bWZK Kvi YI weřkl weřkl vřb wři Mřo I řV| wřři Dbřřbi Rb" miKwi mrvnh", mg_ř I cřřcvl KZv cřřqvRb| AZřřZ bl qre-ev" kvřř i cřřcvl KZvi dřř B XvKivq gmřř b ev gřřk"verř" ři kg wři Mřo DřřVřQj | AvaybKKvřř I miKvřři mrvnh" I mg_řbi dřř, weřkl Křř AbMřni AĀřř wři Mřo řZřř v m=eci řřřřř

4| gb~wĚK Kvi Y

gb~wĚK Kvi YI řKvb řKvb AĀřř weřkl weřkl wři Mřo I řV| GKevi řKvb wři řKvb RvqMvq cřřZřřZ nřř mřřvq ARř KiřřZ cvi řř cieZřřZ Avřřiv Avak řřvK řm vřb wři Kvi Lvbv vřcřř AvMřx nq| dřř řm vřb řmB wřři AřřK Kvi Lvbv Mřo I řV| D`vni Y řřc evj hvq, mřřRvřř vřřři Nwoi weřřRřov L`wřZ AvřřQ eřř bZb bZb Nwo cřřZKvixiv mřřRvřř vřřřB Nwoi Kvi Lvbv vřcb Křř | Gřřře mřřRvřř vřřř Nwo wřři vřřřKvi Y nřřřř

mvi mřřřc

- řKvb GKřř weřkl wřři Avak msL`K Kvi Lvbv řKvb GKřř wřřř řř ev AĀřř Mřo I VřřK wřři vřřřKvi Y eřř | mrvviYZ řmLvřř řKvb GK aiřři wřři řh weřkl cwi řřek I mřřřM-mřřevi cřřqvRb nq řř cvl qv hvq|
- wřři vřřřKvi Yřři Kvi Y_řř vřřK Pvi řřřř řřM Kiv nq| řhgb- (K) cřřKřřZK, (L) A_řřbWZK, (M) ivR%bWZK I (N) gb~wĚK|

cvřřVřři gj`vqb : 12.4

vřřřřřK cřřř

mřřK DĚřři cvřřk wřřK (ř) řřř wřř b:

- 1| wřři vřřřKvi Y eřř řř wřř eřřřř?
 - K. řKvb wři řřři weřřbweřřř Mřo I VřřK
 - L. řKvb wři weřkl vřř Mřo I VřřK
 - M. weřřbweřřřři wři GK vřř Mřo I VřřK
 - N. cwi ewi K cwi řřřř Mřo I Vřř Křři wři řřK

2| wřři vřřřKvi Yřři Kvi YmğřřřK Kq řřřř řřM Kiv nq?

- K. 5 řřřř
- L. 4 řřřř
- M. 3 řřřř
- N. 2 řřřř

i Pbvğj K cřřř

- 1| wřři vřřřKvi Y KřřK eřř? wřři vřřřKvi Yřři cřřKřřZK Kvi Y_řř v eYřřv Ki`b|
- 2| wřři vřřřKvi Yřři cřřKřřZK I A_řřbWZK Kvi Y_řř v mřřřřřc eYřřv Ki`b|

mřřřřř-B-ĐĚi cřřř

- 1| wřři vřřřKvi Y eřř řř wřř eřřřř?
- 2| wřři vřřřKvi Yřři Kvi Y_řř vřřK wřř wřř řřM Kiv hvq?
- 3| wřři vřřřKvi Yřři Amřřevmğřř wřř wřř?

cW 5 : evsj v`tki ewYR`

Df`k` :

G cvW tkfI Avcub-

- ewYfR`i c0qvRbxqZv wK Zv ej tZ cvi teb|
- evsj v`tki ewYfR`i `ewk0`mgn Dfj L-KitZ cvi teb|
- evsj v`tki c0vb c0vb i Bmb `e` wK wK Zv ej tZ cvi teb|
- evsj v`tki c0vb c0vb Avg`wv `e` wK wK Zv eY0v KitZ cvi teb|

AvSR0ZK ewYfR`i c0qvRbxqZv

cW_exi tKvb t`kK Zvi c0qvRbxq me `e` Drcv`b KitZ cvti bv| ZvB tmme cY` msM0ni Rb` GKwU t`kK Ab` t`k ev t`kmgfni Dci wbfP KitZ nq| thvMthvM I hvZvqZ e`e`vi DbwZi dtj cW_exi wefbbet`tki gta` cY` weibgg tefo tMfQ| c0KwZK cwi tek I Drcv`tbi Dcv`vbmgnfni wefbb0zvi Kvi tY cW_exi wefbbet`k wfbwfb0e`e` ev cY` Drcv`tb cwi`wkZv AR0 KitfQ| ZvB wefbbet`k Zv`i ctY`i D0E Ask wef`tk i Bmb Kfi Ges c0qvRbxq th me cY` t`tk Drcv`b Kiv mjeavRbK bq, Zv Avg`wv Kfi | Gfite `uJ mvef`fg i v0fi gta` th ewYR` cwi Pwj Z nq Zv`K AvSR0ZK ev `et`wK ewYR` etj |

evsj v`tki `et`wK ewYfR`i `ewk0`

evsj v`tki `et`wK ewYfR`i c0vb c0vb `ewk0` wbtæ Avtj vPbv Kiv nj :

- 1| KuPvgj i Bmb : evsj v`tki `et`wK ewYfR`i c0vb `ewk0` GB th, t`kwU c0vbZ Kw cY` I KuPvgj i Bmb Kfi | i Bmb ctY`i gta` cvU, Pv, Pvgov, ZvgvK, gvQ, wDRic0U BZ`w` wefki fite Dfj L`hvm`|
- 2| wki RivZ `e` Avg`wv : evsj v`tki `et`wK ewYfR`i Aci GKwU `ewk0` nj , wki RivZ `e` Avg`wv | G_tj vi gta` `bw`b Rxeftbi wefbb0cKvfi i fivM I wej vm `e`, Kvi Lvbi hšcvZ, tj Sn I B`uvZ, Lpiv hšysk, wntgU, Kqj v, I lpcI, i vmvqubK `e` BZ`w` c0vb|
- 3| Lv`km` Avg`wv : evsj v`tki Kw c0vb t`k nI qv mEjI Lv` `qsm0uY`bq| eb`v I Livm wefbb0cKvi `fhM c0q c0Z eQi tj tM_vtK| mZivs c0q c0Z eQi B Mto 20 t`tk 30 j q| Ub Lv`km` Avg`wv KitZ nq|
- 4| tj bt`tbi fvimv` c0ZKtj : evsj v`tki `et`wK ewYfR`i GKwU Dfj L`hvm` `ewk0` GB th, `faxbZvi ci t`tkB evsj v`tki tj bt`b fvimv`g` c0ZKj Ae`v weivRgvb| Kvi Y, i Bmbi Zj bqv Avg`wv AtbK tenk ntq_vtK|
- 5| Rj ct_ AwaK ewYR` : evsj v`tki `et`wK ewYfR`i tenki fivM mgj`a ct_ ntq_vtK| GRb` tgvU Avg`wv I i Bmbi AwaKvsk P`EM0g I Pvj bv e`ti i gva`tg m0ub0nq| tKej gvI fvi Z, tbcvj I gvqvbgti i mvf_ewYfR`K tj bt`b `j ct_ ntq_vtK|
- 6| mi Kwii LvZi c0vb` : `faxbZvi ci evsj v`tki `et`wK ewYfR`i ep`vsk Ges cvU i Bmb m0uY`vte i v0qE Kiv nq| eZ0v`b mi Kwii I temi Kwii DfQ LvZB Avg`wv-i Bmb Pj tQ|

evsj v`tki c0vb c0vb i Bmb `e`

evsj v`tki c0vbZ gv0tgq Kw RivZ cY` I KuPvgj i Bmb Kfi _vtK| mv00ZK eQi _tj vtZ bZb wKQycY` hf` ntqtQ| wbtP G_tj vi msv`B weei Y t` lqv nj :

cvfVvEi gj `vqb : 12.5

^be⁹³K cKæ

mWVK DÈti i cvtk WJK (√) wPy w`b:

1| evsj v`tki Awakvsk ewneWYR` tKvb ct_ ntq _vfk?

K. wegvbct_ L. moKct_

M. Rj ct_ N. t ij ct_

2| evsj v`tki cåvb wZbuU i Bvnb `è" wK wK?

K. wntg>U, mvi , tctUhwj qvg

L. Pvj , Mg, mwi Iv

M. cvU, cvURvZ `è", ^Zwi tcvkvK

N. KvMR, wntg>U, wPub

i Pbv gj K cKæ

1| evsj v`tki cåvb cuPwU i Bvnb `fe"i eYBv w`b|

2| evsj v`tki `et` wK ewWtR"i `ewkó" wK?

msw⁷β-DÈi cKæ

1| `et` wK ewWtR"i cQqvRbxqZv e`vL`v Ki "b|

DÈi gvj v

Abkxj bx 12.1 : 1| M ; 2| L|

Abkxj bx 12.2 : 1| L ; 2| M ; 3| M|

Abkxj bx 12.3 : 1| M ; 2| M ; 3| L|

Abkxj bx 12.4 : 1| L ; 2| L|

Abkxj bx 12.5 : 1| M ; 2| M|

ইউনিট ১৩

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

ভূমিকা

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে আর্থ-সামাজিক অনেক সমস্যার মূলে রয়েছে জনসংখ্যাধিক্য। এ জন্যই বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে একথা সত্য যে, এই জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলে জনসংখ্যা তখন হবে উন্নয়নের সহায়ক। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসম্পদ এ দু'ধরনের সম্পদের সমন্বয়ে ও সদ্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, জনসম্পদের এবং কর্মদক্ষতার উৎস হল জনসংখ্যা। জনসংখ্যা একটি সক্রিয় উপাদান। বস্তুর কামা পরিমাণ শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

পাঠ ১ : বাংলাদেশে জনসংখ্যার স্বরূপ

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার প্রভাব কি তা বলতে পারবেন।
- ১৯০১ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত সময়কালে জনসংখ্যা কি পরিমাণ ও হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত তা উল্লেখ করতে পারবেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার প্রভাব

অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যা একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি সহায়ক উপাদান; কেননা শ্রম ও সংগঠনের মত গুরুত্বপূর্ণ দুটি উৎপাদনের উপাদান সরবরাহ করে জনসংখ্যা। অপরপক্ষে জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হলে উন্নয়নের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কোন দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনসম্পদ না থাকে তবে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হবে না। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হয়। অন্যদিকে, যদি কোন দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে যে পরিমাণ জনশক্তি প্রয়োজন সে পরিমাণেই থাকে, তবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

মনে রাখতে হবে যে, মানুষই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে। এসব কাজে বহু লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় কোন দেশে জনসংখ্যার পরিমাণ অধিক হলে, জনসংখ্যা তখন দেশের জন্য দায় বা বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়। এমতাবস্থায় অপ্রতুল সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে জনগণের মাথাপিছু গড় আয় বা উৎপাদন কম হয়, জীবনযাত্রার মান নেমে যায়, খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়, বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। সব মিলিয়ে উন্নয়নের গতি মন্থর হয়।

জনসংখ্যা ও ভূমির পরিমাণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কোন দেশের মোট ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে ভূমির উপর চাপ পড়ে। মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ কম হয়, উৎপাদন ও সঞ্চয় হ্রাস পায় এবং ভোগ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, জনসংখ্যার তুলনায় ভূমিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ বেশি থাকলে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, আয় ও সঞ্চয় বেড়ে যায়।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই ক্ষুদ্রায়তন দেশে প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে। সারণি-১ এ বিষয়টি দেখানো হল।

সারণি - ১

বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ

বৎসর	মোট জনসংখ্যা (কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির % হার
১৯০১	২.৮৯	.৯০
১৯১১	৩.১৬	.৯৩
১৯২১	৩.৩৩	.৫৩
১৯৩১	৩.৫৬	.৬৯
১৯৪১	৪.২০	১.৭৯
১৯৫১	৪.৪২	০.৯২
১৯৬১	৫.৫২	২.১২
১৯৭৪	৭.৬৪	২.৭০
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৬
১৯৯১	১১.১০	২.১১

উৎস : Bangladesh Bureau of Statistics Census Report, 1991.

উপরের সারণিতে দেখা যায় যে, ১৯০১ সালে বাংলাদেশে ভূখণ্ডে মোট জনসংখ্যা ছিল ২.৮৯ কোটি অর্থাৎ ২ কোটি ৮৯ লক্ষ। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল কিছুটা মন্থর। ১৯৫১ এর পর থেকে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ করা যায়। ১৯৬১ সালে এদেশের জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৫.৫২ কোটি অর্থাৎ ৫ কোটি ৫২ লক্ষ। কিন্তু মাত্র ৩০ বছরে অর্থাৎ ১৯৯১ সালে দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় প্রায় ১১ কোটিতে। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে আগামী ২৫ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। আয়তন একই রয়ে গেছে অথচ লোকসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮১ সালে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৬২৪ জন, ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৫৫ জন। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি। সারণি-২ এ বাংলাদেশসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখানো হল।

সারণি - ২

বাংলাদেশসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব

দেশ	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটারে)
বাংলাদেশ	৮১০
ভারত	২৭৩
পাকিস্তান	১৬১
শ্রীলংকা	২৭০
চীন	১২৬
ইন্দোনেশিয়া	৯৯
মালয়েশিয়া	৫৮
দক্ষিণ কোরিয়া	১৯১

উৎস : World Population Data Sheet, 1993.

পৃথিবীতে এত কম আয়তন বিশিষ্ট কোন দেশে এত বেশি লোক বাস করে না। ক্ষুদ্রায়তন-এ দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমে আসছে। ক্রমবর্ধমান লোকের বসত বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা সহ বিভিন্ন ভৌত কাঠামো গড়ে উঠার কারণে চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ আরও হ্রাস পাচ্ছে। বন কেটে মানুষ বসতি স্থাপন করছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কারণেই সরকার জনসংখ্যাকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এ সমস্যা দূরীকরণে তৎপর হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

- উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক উপাদান। শ্রম ও সংগঠন- এ দুটি উপাদান সরবরাহ করে জনসংখ্যা। কাম্য পরিমাণ শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।
- বাংলাদেশে প্রায় সকল সময়ের মূলে রয়েছে জনসংখ্যাধিক্য সমস্যা। তাই এটি এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।
- পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি- ৭৫৫ জন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

১। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা কত ছিল?

ক. ১২.০০ কোটি

খ. ১১.১০ কোটি

গ. ১০.৮০ কোটি

ঘ. ১০.০০ কোটি

২। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত ছিল?

ক. ৭০০ জন

খ. ৬২৪ জন

গ. ৫২০ জন

ঘ. ৬৫০ জন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক বর্ণনা করুন?

পাঠ ২ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা ও নিম্নমানের জীবন যাত্রার সম্পর্ক কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা কিভাবে খাদ্য ঘাটতির সৃষ্টি করে তা বলতে পারবেন।
- জনসংখ্যা কিভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশে জনসংখ্যাধিক্যের প্রভাব

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এই জনসংখ্যাধিক্যের কারণে সৃষ্ট সমস্যাবলী সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১। দারিদ্র্য ও জীবনযাত্রার নিম্নমান : বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান খুবই নিম্ন পর্যায়ে। এদেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেই বেশি। ফলে দারিদ্র্যের দ্রুত প্রসার ঘটছে এবং সমাজে বিত্তহীনদের সংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে যাদের অবস্থা স্বচ্ছল এবং যারা অধিক সন্তান পালনে সক্ষম তাঁদের সন্তান সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ২৮৩ মার্কিন ডলার। নিম্ন আয় সম্পন্ন এ দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কম। এই মানুষগুলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মত মৌলিক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় না, তারা নানা বঞ্চনার শিকার হয়।

২। খাদ্য ঘাটতি : বাংলাদেশে কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটেছে খুবই সীমিত আকারে। কৃষিকাজে যতটা মূলধন নিয়োগ করা প্রয়োজন তাও অপര്യാপ্ত। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে। দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসমষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন না হওয়ায় খাদ্য ঘাটতি লেগেই আছে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করতে হয়। সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত কোন কোন বছরে বাংলাদেশ খাদ্য শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হলেও দুর্যোগপূর্ণ বছরে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে যায়।

৩। কৃষি জমির উপর চাপ : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের সীমিত চাষযোগ্য জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল ০.৩৩ একর। ১৯৯১ সালে এই পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ০.২৯ একরে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমিগুলো খণ্ড-বিখণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। দরিদ্র কৃষক, প্রান্তিক কৃষক ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বিগত বছরগুলোতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বর্তমানে মোট কৃষকের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ।

৪। বেকার সমস্যা : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের বেকার সমস্যা আরো প্রকটতর করে তুলছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সীমিত রয়ে যাচ্ছে। ফলে বেকার সমস্যা দিন দিন তীব্র আকার ধারণ করছে।

৫। শিল্পোন্নয়নের সমস্যা : বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নে খুবই পশ্চাদপদ। ব্যাপক অশিক্ষার কারণে আমাদের অধিকাংশ শ্রমিকই অদক্ষ। অধিক জনসংখ্যার কারণে জীবনযাত্রার মান নিচু এবং তারা শারীরিক দিক দিয়েও দুর্বল। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগানও সীমিত। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য অনুৎপাদনশীল ব্যয় বৃদ্ধি পায় ও সঞ্চয় কম হয়। সুতরাং বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

৬। মূলধন গঠনের সমস্যা : অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার লক্ষে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং মূলধন গঠন একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পরিবারের আয়তন বড়। আমাদের সঞ্চয়ের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। কাজেই শিল্প ও বাণিজ্যে মূলধনের অভাব দেখা যায়।

৭। নির্ভরতার হার বেশি : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নির্ভরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৫ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। অর্থাৎ বাকি অর্ধেক লোক পরনির্ভরশীল এবং অনুৎপাদনশীল। এ ধরনের নির্ভরতা গোটা সমাজের অগ্রগতির পথে বাঁধাররূপ।

৮। উন্নয়নের সুফল কেন্দ্রীভূত : অধিকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং একই সঙ্গে উন্নয়নের গতি মন্ডুর হওয়ার কারণে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল ভোগ করছে, আয় ও সম্পদ ব্যবহারে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

৯। স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুষ্টি : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক দারিদ্র্য, পরিমিত স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি কারণে স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুষ্টি এদেশে একটি স্বাভাবিক অবস্থার রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে প্রসূতি অবস্থায় চিকিৎসার সুবিধা না থাকায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি।

১০। দুরারোগ্য রোগ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে একদিকে খাদ্য ও পুষ্টির যেমন অবনতি ঘটছে অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশেরও দ্রুত অবনতি ঘটছে, অসামাজিক কার্যকলাপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ একে অন্যের সংস্পর্শে আসছে। এর ফলে ‘এইডস’ নামক একপ্রকার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। হিউম্যান ইমিউনো-ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (HIV) নামক এক প্রকার অতি সূঁ ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে এ রোগের সৃষ্টি করে। এ রোগকে বলা হয় Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এ রোগের বিস্তার ঘটেছে। বাংলাদেশ এর বাইরে নয়। বাংলাদেশের বেশ কিছু লোক এ রোগের শিকার হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে এক কোটিরও বেশি লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এই রোগের নির্ভরযোগ্য কোন প্রতিষেধক ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। এ রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। মানুষের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বহু সমস্যার মূলে রয়েছে এই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি। অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মত বাংলাদেশের জনসংখ্যার উচ্চহারের পেছনে যেসব কারণ আছে তাদেরকে মোটামুটিভাবে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দুভাগে ভাগ করে দেখানো যায়। নিম্নে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(ক) সামাজিক কারণ

১। শিক্ষার অভাব : বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর। শিক্ষার অভাবে তারা নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝতে সক্ষম হন না। তাদের মধ্যে দূরদর্শিতা ও দায়িত্ববোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষার অভাবে এই অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারে না। এজন্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না।

২। নারী শিক্ষার অভাব : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। পুরুষের তুলনায় নারী এ দেশে শিক্ষায় পশ্চাৎপদ। শিক্ষার অভাব ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য মেয়েরা ন্যূনতম স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত। তাই তারা পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মসূচীতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে না।

৩। সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার : বাংলাদেশে বহুবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার প্রচলিত আছে। অশিক্ষা ও ক্রটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই আজো সমাজে গৌড়ামী ও কুসংস্কার বিরাজমান। এই গৌড়ামী ও কুসংস্কার এদেশে উচ্চ জন্মহারের জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

৪। বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ : বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। এখনও শতকরা ৫০ জনের বিবাহকে বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য করা যায়। ১৮ বছর বয়স হবার আগেই অনেক মেয়ের বিয়ে হয়। তারা অনেক কম বয়সে বৈবাহিক জীবন শুরু করে। দীর্ঘ বৈবাহিক জীবনে অনেক সন্তান জন্ম লাভ করে। তাছাড়া এ দেশে বহু বিবাহ এখনও চালু আছে এবং উচ্চ জন্মহারের এটি অন্যতম কারণ। বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কাবিন নিবন্ধনকরণ বাধ্যতামূলক করা হলেও এটা অনেকে এড়িয়ে যান। কাবিন নিবন্ধন না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কাবিনের শর্তাবলী ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই জন্য উচিত।

৫। পুত্র সন্তান কামনা : বাংলাদেশের অনেক পিতা-মাতা পর পর কয়েকটি কন্যা সন্তান হওয়ার পরও পুত্র সন্তান কামনা করেন। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেড়ে যায়।

৬। জলবায়ু : উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বয়ঃসন্ধি লাভ করে। অতি অল্প বয়সেই জনক-জননী হয় এবং এ কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

খ) অর্থনৈতিক কারণ

পাঠ ৩ : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি—

- জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় কি তা বলতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কিভাবে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান আনতে পারে তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

বাংলাদেশ জনসংখ্যা সমস্যায় জর্জরিত। দেশের জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা যায় তা আলোচনা করা হল :

১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম প্রধান উপায় হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সবেশ্চম ও সৃষ্টি ব্যবহার, দ্রুত শিল্পায়ন, কৃষির আধুনিকীকরণ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং একই সাথে মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে। উন্নত জীবনের ছোঁয়া পেলে জনসাধারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানোর যৌক্তিকতা খুঁজে পাবে, পরিবার ছোট রাখতে উৎসাহী হবে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রসার হবে।

২। জনসংখ্যার cpeEb : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা জেলাগুলোর মধ্যে জনসংখ্যার ঘনত্বের বেশ পার্থক্য আছে। যেমন, ঢাকা বা কুমিল্লা জেলার জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। অথচ সে তুলনায় দেশের হাওড় অঞ্চল, পাহাড়ি এলাকা বা উত্তরাঞ্চলের এলাকাগুলোতে এই ঘনত্ব অনেক কম। এমতাবস্থায়, জনসংখ্যার পুনর্বন্টনের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে।

৩। আন্তর্জাতিক স্থানান্তর : পৃথিবীর যে সব দেশ ঘনবসতিপূর্ণ সে সব দেশ থেকে কম ঘনবসতিপূর্ণ দেশে লোক পাঠানো যেতে পারে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানুষের অভাবে অবাবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ঘনবসতিপূর্ণ দেশ থেকে এসব দেশে মানুষের স্থানান্তরের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। অতীতেও এরূপ ঘটেছে। কিন্তু বর্তমানে এ ব্যবস্থার সুযোগ সীমিত; অনেক দেশ আইন করে বিদেশীদের আগমনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে।

৪। শিক্ষা বিস্তার : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য দেশে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। উচ্চ জন্মহারের অসুবিধা, শিশু মৃত্যু প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের সন্মত উপলদ্ধি গড়ে তুলতে শিক্ষার প্রসার আবশ্যিক। শিক্ষিত জনগণ জীবনযাত্রার মান উচু রাখার জন্য পরিবারের আয়তন সীমিত রাখে। তাই ছোট পরিবারের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে শিক্ষা সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে পারে।

৫। কর্মসংস্থানের বহুমুখীকরণ : বাংলাদেশে বিভিন্নমুখী কর্মসংস্থান, যেমন— কুটির শিল্প স্থাপন, হাঁস-মুরগি ও পশু পালন, মৎস্য চাষ, পোশাক তৈরি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংযোজন শিল্প ইত্যাদি গড়ে তুলতে পারলে কর্মসংস্থান, বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে। এজন্য কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার আবশ্যিক।

৬। আইন প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন : বাংলাদেশে সরকার ঘোষিত আইন কার্যকরী করে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা যায়। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ রোধকল্পে বিয়ের ন্যূনতম বয়স পুরুষের জন্য ২১ বছর এবং মেয়েদের জন্য ১৮ বছর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ খুবই কম। ব্যাপক প্রচার ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করে এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৭। পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন : জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হল পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলা। সুপরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করাকে পরিবার পরিকল্পনা বলে। শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করে ও সমাজের গোঁড়ামী দূর করে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি জনপ্রিয় করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করা সম্ভব।

৮। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি : মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি করে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনা যায়। মা যদি পর পর অধিক সন্তান জন্ম দেয় তাহলে মা ও শিশু উভয়ই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মা ও

শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে মানুষ অধিক সন্তানের কামনা বাদ দিবে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাবে।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা যায় তা হল :
 - (ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা;
 - (খ) জনসংখ্যার পুনর্বন্টন করা;
 - (গ) মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি;
 - (ঘ) শিক্ষার বিস্তার;
 - (ঙ) কর্মসংস্থান গড়ে তোলা;
 - (চ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
 - (ছ) পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৩.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

- ১। আইন অনুসারে বাংলাদেশে ছেলেদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স কত?

ক. ২৫ বছর	খ. ২১ বছর
গ. ২৮ বছর	ঘ. ২৩ বছর
- ২। আইন অনুসারে বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স কত?

ক. ১৮ বছর	খ. ২২ বছর
গ. ২০ বছর	ঘ. ১৫ বছর

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে সাহায্য করে?
- ২। জনসংখ্যার পুনর্বন্টন ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তর বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ১৩.১ : ১। খ ; ২। খ

অনুশীলনী ১৩.২ : ১। খ ; ২। গ

অনুশীলনী ১৩.৩ : ১। খ ; ২। ক

